ঐন্দ্রজালিক

সে কালের ব্যাপার। তখন গান ছিল কথা, আর কথা ছিল গান।

রাজকুমারীর দেহে যখন প্রথম ফাল্গুনের হাওয়া লাগ্‌ল, তখন তার হৃদ্-সরোবরে এমন একটি কমল ফুট্‌ল, যার রঙ্ তুরাণ দেশের গোলাপের মতো গোলাপী, আর যার সৌরভ নন্দনের পারিজাতকেও হার মানায়। সেই সৌরভ রাজকুমারীর সারা দেহ সুরভি দিয়ে ঘিরে দিল। সেই সুরভির আভাষে রাজার বাগানের মৌমাছিরা যে গুঞ্জন তুল্‌ল তা'তে ফুট্‌ল রাজকুমারীর প্রাণের গান—

মৌন কথায় বাসুক ভাল
গোপনে
নেহারি যেন নেহারি তারে
স্বপনে—

সেই গান রাজকুমারীর কণ্ঠ জুড়ে' বস্‌ল।

রাজকুমারীর চোখের তারা বিদ্যুৎ-বুকে-করা আষাঢ়ের মেঘের মতো হ'য়ে উঠ্‌ল—গ্রীবায় মোহন ভঙ্গিমা জেগে উঠ্‌ল—গতি মন্থর হ'য়ে উঠ্‌ল—আর সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীর কণ্ঠেও ঐ গুন্ গুন্ গুঞ্জনের গান বিরামহীন হ'য়ে উঠ্‌ল—

মৌন কথায় বাসুক ভাল
গোপনে
নেহারি যেন নেহারি তারে
স্বপনে—

রাজা শুন্‌লেন, রাজমহিষী শুন্‌লেন, পুর-মহিলারা শুন্‌ল—সবাই অশ্চর্য্য হ'য়ে মনে মনে বল্‌লে—

হায় কি কথা হায় কি বাণী
জপিছে বালা অকারণ
রূপসী বালা ষোড়শী বালা
কহে এ কথা কি কারণ!

২

দেশ-বিদেশে রটে গেল, বিরাট রাজকুমারী আজ বিবাহযোগ্যা—ষোড়শী। আর তার রূপ—যেন তিলোত্তমা! পিঠ ছেয়ে কালো চুল—গণ্ড ছেয়ে ফুটন্ত গোলাপ—ঠোঁট ছেয়ে পাকা ডালিমের দানা—আর সারা দেহ ছেয়ে চুম্বকের আকর্ষণী-শক্তি। রাজা ভাবেন, রাজমহিষী ভাবেন, পুরনারীরা ভাবে, এমন কুমারীকে বিয়ে কর্‌তে আসবে সে কোন্ রাজা, কোন্ মহীপতি—সে কোন্ সম্রাট! আর রাজকুমারীর কণ্ঠে গান ওঠে—

মৌন কথায় বাসুক ভাল
গোপনে
নেহারি যেন নেহারি তারে
স্বপনে—

রাজা শোনেন, রাজমহিষী শোনেন, পুরনারীরা শোনে—আর তারা মনে মনে ভাবে—

হায় কি কথা হায় কি বাণী
জপিছে বালা অকারণ
রূপসী বালা ষোড়শী বালা
কহে এ কথা কি কারণ!

৩

ঐ সংবাদই পৌঁছল কাঞ্চীরাজ্যে।

কাঞ্চীপতি শুনলেন বিরাট রাজকুমারী বিবাহযোগ্যা—ষোড়শী। আর তার রূপ যেন তিলোত্তমা। পিঠ ছেয়ে তার কালো চুল—গণ্ড ছেয়ে তার ফুটন্ত গোলাপ—ঠোঁট ছেয়ে তার পাকা ডালিমের দানা—আর সারা দেহ ছেয়ে চুম্বকের আকর্ষণী-শক্তি। কাঞ্চীপতি বল্লেন—আমি বিরাট নগরে যাত্রা করব—বিরাট রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণ কর্তে।

বিরাট নগরে মহাসমারোহ পড়ে'গেল। কি? না রাজকুমারীর বর আস্‌ছে।

কাঞ্চীপতি চল্লেন—পাণি-প্রার্থী হ'য়ে। সে কি তার শোভাযাত্রা। লোক লস্কর—পাইক প্রতিহারী—হাতি ঘোড়া—

বাদ্য ভাণ্ড—সে এক বিরাট ব্যাপার! সে শোভাযাত্রার ভারে যেন পৃথিবী টলে' উঠ্‌ল। কাঞ্চীপতি যে দেশ, যে জনপদ, যে নগর দিয়ে যান সেখানেই লোকেরা বলাবলি করে—হাঁ, একটা রাজার মতো রাজা বটে।

সাতমুল্লুক পেরিয়ে শোভাযাত্রা বিরাট রাজধানীতে উপস্থিত হ'ল। রোসনচৌকি বাজ্‌ল—হুলুধ্বনি উঠ্‌ল—সবার মুখে হাসি আর ধরে না।

কাঞ্চীপতি সরাসর গিয়ে বিরাট রাজকুমারীর কাছে বল্‌লেন—রাজকুমারী আমি তোমার পাণিপ্রার্থী। রাজকুমারীর কণ্ঠে গান ফুটে উঠ্‌ল—

মৌন কথায় বাসুক ভাল
গোপনে
নেহারি যেন নেহারি তারে
স্বপনে—

কাঞ্চীপতি আর 'হাঁ'ও কর্‌লেন না—'হুঁ'ও কর্‌লেন না—মাথা নামিয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই পথেই ফিরে গেলেন।

৪

কাঞ্চীপতির দুর্দ্দশার কথা অযোধ্যায় পৌছল। অযোধ্যারাজ শুন্‌লেন—বিরাট রাজকুমারী বিবাহযোগ্যা ষোড়শী—রূপে যেন তিলোত্তমা—পিঠ ছেয়ে তার কালো চুল—গণ্ড ছেয়ে তার ফুটন্ত

গোলাপ—ঠোঁট ছেয়ে তার পাকা ডালিমের দানা—আর সারা দেহ ছেয়ে চুম্বকের আকর্ষণী-শক্তি।' আর কাঞ্চীপতি তারই পাণিপ্রার্থী হ'য়ে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরেছেন। অযোধ্যারাজ বল্‌লেন—আমি যাবো।

অযোধ্যারাজ সঙ্গী সাথী নিয়ে এলেন বিরাট রাজধানীতে। তাঁর সে কি বেশ! মাথায় স্বর্ণমুকুট, কানে স্বুবর্ণকুণ্ডল, গলায় মুক্তার মালা—তাঁর বিশাল বক্ষের উপরে কত চুণি পান্না মোতি চক্ চক্ কর্‌ছে, কত চন্দ্রকান্ত অয়স্কান্ত বৈদূর্য্যমণি ঝক্ ঝক্ কর্‌ছে—চারিদিকে বিদ্যুৎ খেল্‌ছে। তাঁর মুখে হাসি—চোখে পুলক—রাজকুমারীর কাছে গিয়ে বল্‌লেন—রাজকুমারী অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনের অর্দ্ধেক তোমাকে আমন্ত্রণ কর্‌ছে।

রাজকুমারীর কণ্ঠে গান ফুটে উঠ্‌ল—

মৌন কথায় বাসুক ভাল
গোপনে
নেহারি যেন নেহারি তারে
স্বপনে।

অযোধ্যারাজ আর কথা খুঁজে পেলেন না—মাথার মুকুট নামিয়ে যেমন এসেছিলেন তেমনি ফিরে গেলেন।

৩

কোশলরাজ্যে সংবাদ পৌঁছতে দেরী হ'ল না! কোশলরাজ শুন্‌লেন—তিলোত্তমার মত রূপসী বিরাট রাজকুমারী—পিঠ ছেয়ে

তার কালো চুল, গণ্ড ছেয়ে তার ফুটন্ত গোলাপ, ঠোঁট ছেয়ে তার পাকা ডালিমের দানা, সারা দেহ ছেয়ে তার চুম্বকের আকর্ষণী-শক্তি—আজ ষোড়শী বিবাহযোগ্যা। কাঞ্চীপতি, অযোধ্যারাজ তাকে লাভ করতে গিয়ে ভগ্ন মনোরথ হ'য়ে ফিরেছেন। কোশল-রাজ বল্‌লেন—আমার ভাগ্য পরীক্ষা কর্‌ব।

কোশলরাজ বিরাটরাজ্যে যাত্রা কর্‌লেন—মাথায় তাঁর দেবাশীর্ব্বাদ, কপালে তাঁর শ্বেত চন্দনের তিলক। কি যে তাঁর রূপ—যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষ, প্রশস্ত স্কন্ধ—দেবতার মতো দৃষ্টি, আশীর্ব্বাদের মতো হাসি।

কোশলরাজ চলেন। শঙ্খ বাজে, কাঁসর বাজে, ঝাঁঝর বাজে, বাঁশী বাজে, মুঠো মুঠো ধন রত্ন বিলিয়ে কোশলরাজ বিরাট রাজধানীতে উপস্থিত হলেন।

কোশলরাজ রাজকুমারীর কাছে গিয়ে বল্‌লেন—রাজকুমারী, আমি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। রাজকুমারীর কণ্ঠে কেবল গান ফুটে উঠ্‌ল—

মৌন কথায় বাসুক ভাল
গোপনে
নেহারি যেন নেহারি তারে
স্বপনে—

কোশলরাজের কপোল ঘেমে উঠ্‌ল, তিনিও ফিরে গেলেন।

৬

দেশ-বিদেশে সব রটে গেল। বিরাটরাজ ক্রমে ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন। হায়! কে কোথায় এমন কথা শুনেছে—কে কোথায়! রাজকুমারী তিলোত্তমার মতো রূপসী, পিঠ ছেয়ে কালো চুল, গণ্ড ছেয়ে ফুটন্ত গোলাপ, ঠোঁট ছেয়ে পাকা ডালিমের দানা, সারা দেহ ছেয়ে চুম্বকের আকর্ষণী-শক্তি—শতেক নৃপতি তার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে এলো আর শতেক নৃপতি মাথা নামিয়ে ফিরে গেল। কি হবে—কি হবে—এমন কুমারীর কি হবে! রাজার গালে হাত, রাজমহিষীর গালে হাত, পুরমহিলাদের গালে হাত; তারা বসে' বসে' থাকে আর মনে মনে ভাবে—

হায় কি কথা হায় কি বাণী
জপিছে বালা অকারণ
রূপসী বালা ষোড়শী বালা
কহিছে কথা কি কারণ!

৭

বছর ঘুরে গেল। আবার ফাল্গুনের সাড়া পড়্‌ল। আম-বনের বুকে বসন্তের বাতাস শিহরণ তুল্‌ল। সেই শিহরণে ভিড় করে' সব আমের মুকুল জেগে উঠ্‌ল—তারই মিষ্টি গন্ধে দিক উদাস, আকাশ উদাস, বাতাস উদাস—মন উদাস।

আমের মুকুলের গন্ধে কি আছে কে জানে—শৈশবের স্মৃতি জাগিয়ে দেয়, কৈশোরের খেলা মনে করিয়ে দেয়, যৌবনের গানের রেশ ভাসিয়ে আনে।

কবেকার কোন্ অতীতের সুখস্পর্শ, কোথাকার কোন্ ভবিষ্যতের সুখের আয়োজন—তারই সুখ, তারই রেশ যেন ভেসে আসে—আমের মুকুলের গন্ধে কি আছে কে জানে!

সেদিন রাজার বাগানের দ্বার উন্মুক্ত হ'ল। ঐ যে তরুণ প্রবেশ করে—কে সে? কে জানে। তার সঙ্গী সাথী নেই—মাথায় মুকুট নেই, কানে কুণ্ডল নেই, কণ্ঠে মুক্তার মালা নেই। সেদিন রোসনচৌকিও বাজ্‌ল না, হুলুধ্বনিও উঠ্‌ল না।

তরুণ গিয়ে একগাছি সুশুভ্র যূথিকার মালা রাজকুমারীর পায়ের কাছে রাখ্‌ল।

রাজকুমারী কৌতূহলী হ'য়ে সেই মালা তুলে নিলেন।

সেদিন আর রাজকুমারীর কণ্ঠে গান ফুট্‌ল না। রাজকুমারী একবার খালি মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌লেন। তার গণ্ডের গোলাপ কণ্ঠে কপোলে ছড়িয়ে গেল—আর কিছু না।

বসন্তের হাওয়া রাজার বাগানের উপর দিয়ে দীর্ঘশ্বাস কুড়িয়ে ব'য়ে গেল। বাগানের হাজার ফুল হাজার রঙ্ নিয়ে সেদিন চোখ মেলে জেগে উঠ্‌ল।

রাজা শুন্‌লেন, রাজমহিষী শুন্‌লেন, পুরমহিলারা শুন্‌ল—তাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

বাঁশি ও বেহালা

সবাই ঠিক করেছে তাদের সারা বাড়ীতে সবার চাইতে অকেজো জিনিষ দুটী হচ্ছে বাঁশিটা আর বেহালাখানা, আর সকলের চাইতে লক্ষ্মীছাড়া হচ্ছে ঐ দুটী বস্তুর অধিকারী মোহন।

গোকুলদাসের পাঁচ লাখ টাকার কারবারের মাঝে এতদিন তারা মূর্ত্তিমান অভিশাপের মতো সহ্য করে' এসেছে মোহনের বাঁশির সুর আর তার বেহালার স্বরগ্রাম। মুদ্রার শব্দে আর ওই দুই বস্তুর ঝঙ্কারে কোনখানেই মিল নেই। ঐ মুদ্রার শব্দে শব্দে তাদের প্রাসাদ তুল্য ত্রিতল বাটী খাড়া হ'য়ে উঠেছে, তাদের চৌঘুড়ি জন্ম নিয়েছে কিন্তু ঐ বাঁশি-বেহালার সুর তাদের প্রশস্ত উদ্যানের একটী ফুলকেও ফোটায় নি।

পরের ছেলেকে মানুষ করা কি কঠিন! অথচ জ্ঞাতি-পুত্রকে ফেল্‌বারও উপায় নেই।

২

সেদিন গোকুলদাস বসে' হিসেব দেখ্‌ছিল।

সাঁঝের শাঁখ কখন বেজে গিয়েছে—ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ কখন জ্বালা হয়েছে—জ্যোস্না-ঢালা বারান্দায় ছেলে-মেয়েরা বৃদ্ধা

দাসীর মুখে রাজ পুত্তুর কোটাল পুত্তুরের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে কখন ঢলে' পড়েছে—দাসীর চোখও ঢুলু ঢুলু হ'য়ে গল্প-কথা তার মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে অবশেষে থেমে গিয়েছে—তার মাথাটা থামের গায়ে হেলে পড়েছে—একটা কুকুর দূরে কোথায় চাঁদের পানে চেয়ে থেকে থেকে হঠাৎ ডেকে ডেকে উঠ্‌ছে।

সেদিন তখনও গোকুলদাসের হিসেব দেখা শেষ হয় নি।

মাটীর প্রদীপ জ্বালা, তার সাম্‌নে খেরো বাঁধা প্রকাণ্ড হিসেবের খাতা, আর তার সাম্‌নে গোকুলদাস। হিসেবে এক ক্রান্তি কিছুতেই মিলছিল না। এক বার দু বার তিন বার চার বার পাঁচ বার—কিন্তু ক্রান্তির ভুল কিছুতেই ধরা পড়্‌ছিল না।

সুতো-বাঁধা চশ্‌মা জোড়াটা কাপড়ের খুঁটে মুছে প্রদীপের সলতেটা উস্‌কে দিয়ে ষষ্ঠবার যখন হিসেব দেখ্‌তে যাবে তখন অন্দর থেকে বাতাসে ঢেউ খেল্‌তে খেল্‌তে একটা পরিপাটী বেহালার সুর গোকুলদাসের কানে এসে পড়্‌ল—বেহালার চড়া তারটায় ছড়ের একটা মোলায়েম টান, তারই চিন্ চিন্ ছিন্ ছিন্ খিন্ খিন্ সুর ধারাল ছুরি দিয়ে কাটার মতো গোকুলদাসের হিসেব-কসার ঘরটার বাতাসকে চৌচির করে' দিল—দেয়ালের গায়ে সাজান রাশিকৃত পুরোণো হিসেবের খাতার বুকে বুকে কম্পন লাগ্‌ল।

গোকুলদাসের জীবনের তাল যেন কেটে গেল। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল, ঠোঁটের কোণ কাঁপতে লাগল। চোখের চশ্‌মা খুলে রেখে হিসেব-কসার হাতের কলমটা কানে গুঁজে বহু তালিমারা

চটী জোড়া পায়ে দিয়ে গোকুলদাস অন্দর অভিমুখে ধাবিত হ'ল।

মোহন তখন বেহাগের আলাপ ধরেছে। বেহাগের সুরের কাঁপন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল—একটা আবেগ আকুলতায়, একটা ক্রন্দনে ক্রন্দনে, একটা নিবিড় ব্যাকুলতাভরা আকাঙ্ক্ষায়—বেহাগের সুর বল্‌ছিল—

> চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরে—সে অশ্রুতে যে মুক্তা গড়ে—সেই মুক্তা দিয়ে গাঁথা আমার মালা—এ-মালা আমি ধনীর হাতে দিতে পারিনে—দরিদ্রের ঘরে রাখ্‌তে পারিনে—হায় এ-মালা নিয়ে আমি কি কর্‌ব……
>
> চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরে—সে অশ্রুতে যে মুক্তা গড়ে—সেই মুক্তা দিয়ে গাঁথা আমার মালা—এ-মালা আমি রূপসীর হাতে দিতে পার্‌ব না—কুৎসিতার কাছে রাখ্‌তে পার্‌ব না—হায় এ-মালা নিয়ে আমি কি কর্‌ব……
>
> চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরে—সে অশ্রুতে যে মুক্তা গড়ে—সেই মুক্তা দিয়ে গাঁথা আমার মালা—হায় এ-মালা নিয়ে আমি কি কর্‌ব?—এ যে নিজের কাছে রেখে তৃপ্তি পাইনে—পরের হাতে দিয়ে স্বস্তি পাইনে—হায় এই আমার মালা—আমার মালা—আমা……

প্রথম বর্ষায় জেগে ওঠা দুর্ব্বাদলের মতো একটী ছোট্ট মেয়ে দৌড়ে মোহনের ঘরে ঢুকল—হাঁপাতে হাঁপাতে ত্রস্তে বল্‌লে—"মোহন দা, জ্যাঠামশায় আস্‌ছেন।"

ছড় থেমে গেল—শোনা গেল গোকুলদাসের পায়ের চটির ক্রুদ্ধ চট্‌ পট্‌ শব্দ।

বেহালার ছড় নামিয়ে রেখে মোহন ঘর থেকে বেরিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

চটির ক্রুদ্ধ শব্দ ক্রমে কাছে এলো—গোকুলদাস এসে মোহনের ঘরে প্রবেশ কর্‌ল। দেখ্‌লে মোহন নেই, আছে কেবল ছোট্ট মেয়েটী। ক্রুদ্ধ স্বরে গোকুলদাস জিজ্ঞেস কর্‌ল—"মোহন কোথায় রে বুলি?"

—"এখনি কোথায় বেরিয়ে গেল জ্যাঠামশায়!"

গোকুলদাসের দৃষ্টি পড়্‌ল বিছানায় বেহালাটার উপর—সে বেহালার তখনও আওয়াজে আওয়াজে বুক ভরা, তার তারে তারে সুরের রেশ। বেহালাটা তুলে নিয়ে গোকুলদাস মেজের উপর আছাড় মেরে' ফেল্‌লে—বেহালার তার ছিঁড়্‌ল, কান ভাঙ্‌ল, বুক ফেটে গেল। গোকুল বল্‌লে—"লক্ষীছাড়াটা এলে আমাকে খবর দিস্ ত রে বুলি!" দূরে বাঁশীর সুর বেজে উঠ্‌ল—বালিকা পুলকে বলে' উঠ্‌ল—"ঐ যে মোহনদার বাঁশি!" বাঁশির বুক থেকে সুর বেরিয়ে জ্যোস্নার গায়ে যেন গলে' গলে' পড়্‌ছে। বাঁশির গান বল্‌ছে—

> জ্যোস্না সুর বাজায়—সেই সুরেরই এক একটিকে ধরে' এক একটি অপ্সরীর জন্ম—তাদের আনন্দ-পুলকিত-আঁখি—হাস্য-বিকশিত-আনন—ছন্দে-ঘেরা গতি—আর কিছুই না—কেবল জ্যোস্নার সুর……

গোকুলদাস গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—"মোহনের আর এখানে জায়গা হবে না।"

সবাই শুন্‌ল—এ বাড়ী থেকে মোহনের অন্ন-জল এতদিনে উঠ্‌ল।

গোকুলদাসের হিসেব আর সেদিন মিল্‌ল না।

বাঁশি বাজতেই লাগ্‌ল—

ছন্দে-ঘেরা গতি—আর কিছুই না—কেবল জ্যোৎস্নার সুর—ঐ সুরে ওদের জন্ম—ওই সুরে ওরা আকাশের গায়ে আলপনা দেয়—ওই সুরে সুরে ওরা তারার বাতি জ্বালে—ওরা—ওই অপ্সরীরা—আর কিছুই নয়—আর কিছু নয়·········

৩

গোকুলদাস একেবারে নিশ্চিন্ত। সদরে অন্দরে একেবারে জমাট ভাব। কোনখানে একটু বাজে কাজ নেই, অকেজো কথা নেই। কেবল মুদ্রার শব্দ—কারবারী নৌকোর মহাজনদের আলাপ—পাটের দালালদের হিসেব-নিকেশ—আমদানি-রপ্তানির কাহিনী।

কিন্তু অলক্ষ্যে কোথায় যেন সুর কেটেছে।

গোকুলদাসের হিসেবে যে ক্রান্তির ভুল ছিল তা তার পরদিন কড়ার ভুলে দাঁড়িয়েছে—তার পরদিন কড়ার ভুল দাঁড়িয়েছে গণ্ডাতে—গণ্ডা দাঁড়িয়েছে পোণে—পোণ দাঁড়িয়েছে চোকে—কোথায় যেন সুর কেটেছে অথচ ঠিক ধরা যাচ্ছে না।

গোকুলের হিসেবের গরমিল বেড়েই চল্‌ল। মানুষের অন্তরের যে প্রদেশটায় মুদ্রার শব্দ পৌঁছে না, কারবারী নৌকোর মহাজনদের আলাপ পৌঁছে না, পাটের দালালের হিসেব-নিকেশ পৌঁছে না, আমদানি-রপ্তানির কাহিনী পৌঁছে না, গোকুলদাসের অন্তরের সেইখানটায় ক্রমে ক্রমে একটা সন্দেহ জমে' উঠতে লাগ্‌ল—গোকুল মনে মনে ভাবে—"তবে কি—"

একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—"মোহন কোথায়?"

কেউ জানে না।

আদেশ দিল "মোহনের খোঁজ করতে হবে।"

মোহনের খোঁজ চল্ল—চারিদিকে কত ক্রোশ ব্যেপে—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—এক সহর থেকে আর এক সহরে। কিন্তু মোহনকে পাওয়া গেল না।

মাল বোঝাই মহাজনী নৌকো আসে, নৌকোর মাল খালাস হয় না—পাটের দালাল তার হিসেব নিয়ে আসে, সে হিসেব অম্‌নি পড়ে' থাকে—আমদানি-রপ্তানির কাহিনীও শোন্‌বার লোক নেই।

গোকুলদাস ঘোষণা করলে, যে মোহনের খোঁজ করতে পারবে তার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

বন্ধু-বান্ধবেরা ঠিক করল এত দিনে গোকুলের মাথা খারাপ হয়েছে।

কিন্তু মোহনের খোঁজ কেউ দিতে পারলে না।

অবশেষে গোকুল বল্লে—"আমি নিজে বেরুব মোহনের খোঁজে।"

কয়েকদিন কোথায় কোথায় ঘুরে গোকুল বাড়ী ফির্‌ল—শ্রান্ত দেহ, ম্লান মুখ, যে ক-গাছি চুল কাঁচা ছিল তা সাদা হয়ে গেছে। গোকুলের হাতে একটি নতুন বেহালার বাক্স।—মোহনের খোঁজ মেলেনি।

ছোট্ট মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে বৃদ্ধ গোকুলের হাত ধরে' জিজ্ঞেস্ কর্‌ল—"জ্যাঠামশায় এ বেহালা কার?"

বৃদ্ধ বল্‌লে—"মোহনের জন্যে।"

—"জ্যাঠামশায় মোহনদার খোঁজ, আমরা যে দাসীর মুখে রাজ পুত্তুর কোটাল পুত্তুরের গল্প শুনি, সেই দাসী জানে।"

গোকুল বল্‌লে—"চল্‌ তার কাছে।"

দাসীকে গোকুল জিজ্ঞেস্‌ কর্‌ল—"মোহন কোথায় ?"

—"লুকিয়ে আছে।"

—"তা ত জানি—কোথায় ?"

—"চিলে-কোঠায়।"

—"এই বাড়ীর ?"

—"এই বাড়ীর।"

গোকুল উচ্চ হাস্য করে' উঠ্‌ল—বল্‌লে—"আর আমরা তার খোঁজে দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছি। বুলি, এই বেহালাটা মোহনকে দিস্‌ বলিস্‌ আর লুকিয়ে থাক্‌বার দরকার নেই।"

বেহালা নিয়ে বালিকা চিলে-কোঠায় ছুট্‌ল।

সাঁঝের শাঁথ কথন বেজে গিয়েছে—ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ কথন জ্বালা হয়েছে—জ্যোস্না-ঢালা বারান্দায় ছেলে মেয়েরা বৃদ্ধা দাসীর মুখে রাজ পুত্তুর কোটাল পুত্তুরের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে কথন ঘুমিয়ে গিয়েছে—দাসীর চোখও ঢুলু ঢুলু হ'য়ে গল্প-কথা তার মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে অবশেষে একেবারে থেমে গিয়েছে—তার সাদা মাথাটা, থামের গায়ে হেলে পড়েছে।

বহুদিন পরে সেদিন গোকুলদাস হিসেবের খাতা নিয়ে বসেছে।

বহুদিন পরে সেদিন আবার বেহালার সুর বেজে উঠল। গোকুলদাস ধীরে ধীরে হিসেবের খাতাটা বন্ধ করল।

বেহালার গান বল্‌ছিল—

সুর—কেবল সুর—জগৎ-ভরা কেবল সুর—আর কিছু নয়—রঙ্গে সুর—গন্ধে সুর—ফুলে সুর—সুর—কেবল সুর—জগৎ-ভরা কেবল সুর…

তরুণীর চোখে সুর—তরুণের বুকে সুর—প্রেমে সুর—স্নেহে সুর—মোহে সুর—সুর—কেবল সুর—জগৎ-ভরা কেবল সুর……

বেহালার গান থাম্‌ল। চটীর চট্ পট্ শব্দ শোনা গেল। মোহনের গা ঘেঁসে বালিকা দাঁড়িয়েছিল। বল্‌লে "মোহন দা, ঐ যে জ্যাঠামশাই আস্‌ছে।"

গোকুল মোহনের ঘরে ঢুকল জিজ্ঞেস্ করল "তোর সে বাঁশিটা নেই রে মোহন?"

—"আছে জ্যাঠামশাই।"

গোকুল দাসের হিসেবে আর ভুল হয় না।

রূপান্তর

সে ছিল কুৎসিতা ভিখারিণী আর সে ছিল জন্মান্ধ ভিখারী। দুজনের দেখা হ'ল একদিন নগর-প্রাচীরের বাইরে।

ভিখারিণী ভিখারীকে বল্‌ল—"দেখ তুমি অন্ধ ভিখারী, আর আমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই। আমি তোমার হাত ধরে' নিয়ে যাব—আমরা এক সঙ্গে ভিক্ষে কর্‌ব। তা'তে তোমারও সুবিধা আর আমারও—"। ভিখারিণী ঠিক কথাটা খুঁজে পেল না।

ভিখারী বল্‌লে—"তাতে আমার সুবিধা হবে বুঝলুম কিন্তু তোমার কাঁধে যে সুধু একটা বোঝাই চাপিয়ে দেওয়া হবে।"

ভিখারিণী বল্‌লে—"ওম্‌নি একটা বোঝা না হ'লে মানুষ বাঁচে না।"

সেই দিন থেকে তারা দুজনে এক সঙ্গে ভিক্ষে করে। ভিখারিণী ভিখারীর হাত ধরে' রাজপথে পথে ফেরে আর ভিখারী ভিখারিণীর কল্যাণ কামনা করে।

২

এক একদিন তারা নগর ছাড়িয়ে, বহুদূর চলে' যায়—সেখান থেকে ফিরতে দেরী হ'য়ে যায়—মাথার উপরের সূর্য্য প্রখর হ'য়ে ওঠে, পথের ধুলো তেতে ওঠে, পথ চল্‌তে চল্‌তে ভিখারী ভিখারিণীকে বলে—"ভিখারিণী তোমার কষ্ট হচ্ছে!"

ভিখারিণী উত্তর দেয়—"এম্‌নি কষ্ট ছিলনা বলে' জীবন অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল।" ভিখারী আর কোন কথা খুঁজে পায় না।

এক একদিন পথ চলতে চলতে শন্ শন্ করে' বৃষ্টি নেমে আসে, মাথার উপরকার দেয়া গুর্ গুর্ করে' তার ক্রোধের আভাস দেয়। দুজনে গিয়ে কোনো বটগাছতলায় আশ্রয় নেয়। পাতার ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টিধারা এসে তাদের সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে দেয়, বাতাসের দাপট্ জলের ঝাপট্ তাদের বস্ত্র-বিরল দেহে শীত জাগিয়ে তোলে, ব্যথিত-কণ্ঠে ভিখারী ভিখারিণীকে বলে—"ভিখারিণী তোমার কি কষ্টই না হচ্ছে!"

ভিখারিণী উত্তর দেয়—"কষ্ট? কষ্ট ত হচ্ছেই—এই কষ্ট ছিলনা বলে' জীবনটা দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছিল।"

ভিখারী চুপ করে' থাকে।

এমনি করে' তাদের দিন কাটে।

৩

অন্ধ ভিখারীর ভিখারিণীর সঙ্গে আরও নিবিড় পরিচয় হচ্ছিল—কথার মধ্য দিয়ে নয়—স্পর্শের মধ্য দিয়ে। ভিখারিণী ভিখারীর

হাত ধরে' ধরে' রাজপথে পথে গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে ফেরে। ভিখারিণীর স্পর্শ ভিখারীর হাতকে যেন অশোক ফুলের মালার মতো ঘিরে থাকে, দিনে দিনে সেই স্পর্শ তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে তার প্রতি রক্তবিন্দুটীর কাছে একটা নিবিড় ব্যথার সার্থকতাকে স্পষ্ট করে' তুলছিল। বহির্দৃষ্টিহীন ভিখারী দিনে দিনে ভিখারিণীকে পাচ্ছিল একটা ব্যবধানহীন অন্তরঙ্গ সত্যের মতো।

ভিখারী একদিন বল্‌লে—"ভিখারিণী একটি দিনের জন্যও যদি আমি দৃষ্টি ফিরে পাই, কি ইচ্ছেই হয় তোমায় একবার দেখি।"

ভিখারিণী চম্‌কে উঠে ভিখারীর হাত ছেড়ে দিলে। হায় কুৎসিতা ভিখারিণী জানে যে অন্ধ বলেই ভিখারীকে সে কাছে পেয়েছে।

ভিখারী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস কর্‌ল—"ভিখারিণী, তুমি চম্‌কে উঠ্‌লে যে?"

ভিখারিণী ভিখারীর হাত আবার গ্রহণ করে' উত্তর দিলে—"কই, না ভিখারী, আমি চম্‌কে উঠি নি।" ভিখারিণীর চোখের পাতে অশ্রু।

ভিখারী ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌ল, আবার জিজ্ঞেস কর্‌ল—"ভিখারিণী, তোমার চোখের পাত ভিজে উঠ্‌ল কেন?

ভিখারিণী, জিজ্ঞেস কর্‌ল—"ভিখারী তুমি কি যাদুকর, আমার চোখের পাতে জল তুমি জান্‌লে কি করে'?"

ভিখারী নীরব হ'য়ে গেল। তারপর খানিকক্ষণ পরে ধীরে

ধীরে উত্তর দিলে—"কেমন করে' জানি, তা জানি না ভিখারিণী।"

দুজনে অবাক হ'য়ে চুপ করে' থাকে।

একদিন ভিখারিণী বল্‌লে—"জান ভিখারী তুমি দৃষ্টি পেলে আমি তোমায় হারাব?"

—"কেন—কেন—ভিখারিণী?"

—"কেন?"—কঠিন হ'য়ে ভিখারিণী উচ্চারণ কর্‌ল—"আমি—আমি অতি কুৎসিত।"

একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ভিখারীর ঠোঁট ছুঁয়ে গেল, বল্‌লে—"তুমি কুৎসিত ভিখারিণী? তুমি তোমার স্বরূপ দেখতে পাওনি, তাই—আমার অন্ধ আঁখি তা দেখেছে, আমি যে দেখেছি তোমার দেবী প্রতিমার মতো প্রতিমূর্ত্তি, চক্ষে তোমার করুণা, ঠোঁটের রেখায় তোমার স্নেহ, হাতে তোমার প্রস্ফুটিত শতদল, গণ্ডে তোমার রক্ত-কমলের আভাস।"

ভিখারিণীর ঠোঁটে একটা নীরব হাসি জেগে উঠল সে হাসিতে যেন বিশ্বের দুঃখভার ছোঁয়ানো।

তারপর কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ভিখারী বল্‌লে—"তবু তবু একবার ইচ্ছে হয় তোমাকে খোলাচোখে দেখি।"

৪

দুদিন থেকে ভিখারিণীর অন্তরে তুমুল ঝড়। ভিখারিণী স্বপ্ন দেখেছে ভিখারীর দৃষ্টিলাভ হবে। কিন্তু ভিখারীর দৃষ্টিলাভ হ'লে—তারপর? কুৎসিতা সে—তা'কে আবার তেম্‌নি বান্ধবহীন

একাকী পথে পথে বিচরণ কর্‌তে হবে। কুৎসিতাকে কে জীবনের সঙ্গিনী কর্‌বে ?

অবশেষে নারী-অন্তরে নিঃস্বার্থপরতাই জয়ী হ'ল। ভিখারিণী বল্‌লে—"ভিখারী জান ?"

—"কি ভিখারিণী ?"

—"তুমি চোখ ফিরে পাবে।"

ভিখারীর মুখে আর কথাই ফোটে না।

ভিখারিণী বল্‌লে—"দেবীসরোবরে আবক্ষ নিমজ্জন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ঠিক সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তে মহালক্ষ্মীর মন্দিরের নির্ম্মাল্য তোমার চোখে ছোঁয়ালে তোমার অন্ধত্ব ঘুচ্‌বে।

—"সত্যি ভিখারিণী ?"

—"মহালক্ষ্মী স্বয়ং আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন।"

ভিখারীর মুখমণ্ডল একটা পুলকের জ্যোতিতে ভরে' গেল। ভিখারিণীর চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু জেগে উঠ্‌ল। ভিখারী জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কবে ভিখারিণী ?"

ভিখারিণী বল্‌লে—"আস্‌ছে মকর সংক্রান্তির দিন।"

৩

দেবী-সরোবরে দু'জনে আবক্ষ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে। ভিখারীর হাতে নির্ম্মাল্য। ভিখারিণী সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা কর্‌ছিল।

সূর্য্যদেব উঠ্‌তেই ভিখারিণী ভিখারীর দু'চক্ষে তার হাতের

নির্ম্মাল্য স্পর্শ করাল। বদ্ধ আঁখি খুলে' গেল—অন্ধ আঁখি দৃষ্টি পেল।

ভিখারীর উজ্জ্বল চোখ পুলকে উদ্ভাসিত—অন্তরের ভক্তি সেখানে উছ্‌লে পড়ছে।

ভিখারিণীর হাত চেপে ধরে' তার মুখের উপরে নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' গদগদস্বরে ভিখারী বল্‌লে—"তুমি—তুমি ভিখারিণী—"

ভিখারিণীর সমস্ত মুখমণ্ডল আরক্তিম হ'য়ে উঠল—নয়ন নত হ'য়ে সরোবরের জলে নিবদ্ধ হ'ল। ভিখারিণীর অন্তরটা হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌ল—কুৎসিতা ভিখারিণী দেখ্‌লে জলে আপন মূর্ত্তি—দেবী-প্রতিমার মতো, গণ্ডে রক্ত-কমলের আভা, চোখে বসন্ত-উষার নির্ম্মলতা।

অন্তরে কোন্ দিব্য-বস্তুর আবির্ভাবে যে কুৎসিতা ভিখারিণী ধীরে ধীরে বাহিরে অনিন্দ্য হ'য়ে উঠেছিল—তা সে জান্‌তেই পারে নি।

পলাতক

রোজ যখন মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করে' পালঙ্কে গা ঢেলে দিয়ে রাজা বিশ্রাম করেন তখন কোথা থেকে কার বাঁশীর সুর পরিখা প্রাচীর ডিঙিয়ে মহলের পর মহল অতিক্রম করে' বাতায়ন দিয়ে রাজার বিশ্রাম-কক্ষের কোণে কোণে কড়ি বরগায় আসবাব পত্রে সুর লাগিয়ে দেয়। সে সুর যেমন করুণ তেমনি মধুর তেমনি উদাসকরা। রাজার বিশ্রাম আর হয় না—মন উদাসী হ'য়ে যায়। রাজা ভাবেন—কি, অতুল ঐশ্বর্য্যের চাইতে বাঁশীর সুর বড় হ'ল? একদিন কোটালকে ডেকে বল্লেন—কোটাল বাঁশী যে বাজায় তার সাজা হওয়া চাই।

ওম্নি সাত শ' পাইক দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়্ল বাঁশী যে বাজায় তার তল্লাসে।

তল্লাস যখন মিল্ল তখন দেখা গেল সে বাঁশী একটী ছোট্ট রাখাল বালকের হাতের একটা বাঁশের বাঁশী। দুপুর বেলা মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে নদীর ধারে বটের ছায়ায় বসে' সে তাই বাজায় আর তারই সুর রাজ-প্রাসাদের চূড়ায় গিয়ে লাগে, চূড়ার শুভ্রতা ম্লান হ'য়ে ওঠে। পাইকরা রাখাল বালককে ধরে' রাজসভায় হাজির কর্‌ল।

রাজসিংহাসনের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজজ্যোতিষী। রাজজ্যোতিষী বল্‌লেন—মহারাজ এ রাখাল বালকের কপালে সুলক্ষণ দেখ্‌ছি—এ বালক পৃথিবী জয় করবে।

বালকের হাতের শৃঙ্খল খসে' পড়ল—সাত শ' পাইকের কাঁধের মুক্ত কৃপাণ নত হ'য়ে ভূমি স্পর্শ করল—সভাসদ্‌দের ভ্রূকুটী-কুটিল লোচন সম্ভ্রমে ভরে' উঠ্‌ল।

রাজা বল্‌লেন—আমার একমাত্র সন্তান—একমাত্র কন্যা—এই বালকের সঙ্গে তার বিয়ে দেব। এই বালক এ রাজ্যের যুবরাজ।

মন্ত্রী নীরবে মাথা নত করে' রাজবাক্যের অনুমোদন করলেন।

২

রাখালের সারা দেহ মণি মুক্তা মোতির দ্যুতিতে ঝল্‌মল্ করে' উঠ্‌ল। তার মাথায় শিরস্ত্রাণ, কানে কুণ্ডল, কণ্ঠে মালা, নগ্নপ্রায় অঙ্গ স্বর্ণখচিত পট্টবস্ত্রে শোভিত হ'ল।

বালক গরু চরাতে চরাতে বাঁশী বাজাতে বাজাতে এই রাজ-পুরী কতবার লক্ষ্য করে' দেখেছে। প্রকাণ্ড সাতমহলা রাজপুরী না জানি এর অন্তরে কত যুগের ধন রত্ন সঞ্চিত—ওর কোণে কোণে কত কত গোপন রহস্য গোপন কথা গচ্ছিত—ওর কক্ষে কক্ষে প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে না জানি সে কি! এম্‌নি সব কত অস্পষ্ট অস্পষ্ট কথা তার মনে জাগ্‌ত। আজ সে রহস্যের আবাস তার

চোখের সাম্‌নে আপনার অন্তর উন্মুক্ত করে' দিল। বালকের অন্তরের কৌতূহল আজ তার দু'চোখ দিয়ে উপ্‌চে পড়্‌ল।

বালকের দু'চোখের কৌতূহল রাজপ্রাসাদের সাতমহলে ছড়িয়ে গেল—রাজপ্রাসাদের সাতমহলের ঐশ্বর্য্য বিভব তার দু'চোখ বিস্ফারিত কর্‌ল। রাজার সাতমহল জুড়ে' তার আর দেখার বিরাম হয় না, অনুসন্ধানের শেষ হয় না। কত সোপানের পর সোপান, কক্ষের পর কক্ষ, প্রাঙ্গনের পর প্রাঙ্গন, মহলের পর মহল। বালকের ক্ষুধা আর মেটে না—যে রহস্য সে খুঁজে বেড়ায় সে রহস্য আর মেলে না। যেখানেই তার চোখ পড়ে সেখান থেকেই যেন রহস্য অপসারিত হ'য়ে আর কোথাও আশ্রয় নেয়।

এম্‌নি করে' দিন কাটে। রাজ্যের যুবরাজ রাজার ভাবী জামাতা কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ কর্‌ল, তখন রাজ-কুমারী পরিপূর্ণ-যৌবনা ষোড়শী। তার চোখের পাতে বিদ্যুৎ, কুন্তলজালে সুরভি, ঠোঁটের কোণে আশা-আশঙ্কার মিলন, সারা দেহে বাঁশীর সুর। রাজা বল্‌লেন মন্ত্রী, কন্যা সম্প্রদানের আয়োজন কর।

সাতমহলা রাজপুরী জুড়ে' সমারোহের সাড়া পড়ে' গেল।

বিয়ের রাত। রাজধানী জুড়ে' উৎসবের আয়োজন। সাত-মহল ব্যেপে উৎসব-সজ্জা। দেয়ালে দেয়ালে পুষ্প-পল্লবের সুচারু বিন্যাস। দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে উঠেছে। পূর্ব্ব

পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ রাজপুরীর চার সিংহ-দ্বারের উপরকার নহবৎ-খানায় রোসনচৌকির করুণ সুর বাজ্‌ছে।

উৎসবের কোলাহল ছাপিয়ে সেই রোসনচৌকির সানায়ের করুণ সুর যুবরাজের কানে এসে বাজ্‌ল।

ঐ সুরের সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের মনে পড়্‌ল একটী রাখাল বালকের কথা—তার চোখের সাম্‌নে কেমন একটা স্পষ্টতা নিয়ে ভেসে উঠ্‌ল নিদাঘ-দুপুরের একটা নিবিড় শান্ত ছায়া-শীতল বটগাছ—একটা পরিচিত-কণ্ঠ নদী—একটা উন্মুক্ত বিজন প্রান্তরের বন্ধনহীন অবসর।

শঙ্খ কাঁশী কাড়া বেজে উঠ্‌ল—পুরনারীদের হুলুধ্বনিতে চারিদিক ভরে' গেল—লগ্ন উপস্থিত। পৌরজনেরা বরানুগমন কর্‌তে গিয়ে দেখে শিরস্ত্রাণ কুণ্ডল কণ্ঠমালা পড়ে আছে কিন্তু যুবরাজ নেই। সারা পুরীতে তার খোঁজ মিল্‌ল না।

রাজা কুপিত হলেন। রাজ-জ্যোতিষীকে আহ্বান করে' ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌লেন—জ্যোতিষী, তোমার শাস্ত্র মিথ্যা, তোমার গণনা ভ্রান্ত।

জ্যোতিষী বিনীত স্বরে উত্তর দিলেন—মহারাজ, আমা[র] গণনা কিছুমাত্র ভ্রান্ত নয়। রাজকন্যা ও রাজসিংহাসনে যার [ম]ন বাঁধ্‌ল না সে প্রকৃতই পৃথিবী জয় করেছে।

তার পরদিন অনেক বছরের পর দ্বিপ্রহরের বাঁশীর সুর আবার রাজার মনকে উদাস করে' দিল।

পরম আত্মহত্যা

মনস্থ করলুম আত্মহত্যা কর্‌ব—মনস্থ করেই জীবনটা একেবারে হাল্‌কা হ'য়ে গেল। আঃ! এমন শান্তি গত পাঁচ বছরে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অনুভব করিনি।

এই পাঁচ পাঁচটী বছর যে কাটিয়েছি—তার প্রতিটি সেকেণ্ড মনে হয়েছে এক একটা প্রকাণ্ড সীসার ড্যালা যা আমার জীবনের উপর দিয়ে ঘণ্টায় ইঞ্চি হিসেবে গড়িয়ে চলেছে। অথচ মানুষের যা কিছু জীবনের কাম্য—এই পৃথিবীতে সুখভোগ কর্‌তে হ'লে যা কিছু দরকার, তার কোন্‌টার আমার অভাব? তরুণ বয়স, সুশ্রী চেহারা, অগাধ ঐশ্বর্য্য, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—এর কোন্‌টার অভাব আমার? অথচ এই পৃথিবীর কোন আকাঙ্ক্ষাই আমাকে স্পর্শ কর্‌ল না—কোন সুখ কোন দুঃখই আমার হৃদয়কে দোলা দিল না। আমাকে মোহিত কর্‌ল, না এর কাঞ্চন—না এর কামিনী।

হামেসাই শুন্‌তে পাই মানুষের বেঁচে থাকায় সুখ আছে। হয়ত আছে, কিন্তু সে সুখের সন্ধান আমার কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছায় নি। আমি জানি মানুষের জীবন একটা দারুণ দুঃখ, একটা

নিবিড় বেদনা। আর এ বেদনা কবিয়ানার বেদনা নয়—এ বেদনায় কবিয়ানার স্পর্শ মাত্র নেই—এ বেদনা একটা প্রচণ্ড গন্ধময় ব্যাপার—এ কাঁটার মতো বেঁধে—স্বর্ণ শৃঙ্খলের মতো বাঁধে না।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা গোপন গ্রন্থি আছে, জীবন ভরে' যার চারপাশে তার সুখ দুঃখের পশরা সজ্জিত হ'তে থাকে—যার চারপাশে তার জীবনের আলো ছায়া আশা নিরাশা অনুরাগ বিরাগের লুকোচুরি খেলা চল্‌তে থাকে—যে রহস্য-গ্রন্থিকে ঘিরে' তার জীবনের তপস্যা ও সাধনা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আমার জীবনে এই গোপন-গ্রন্থি এই রহস্য-গ্রন্থি কোথায়? তার সন্ধান মেলে নি। কোন সাধনা কোন তপস্যাই আমার জীবনে সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল না। যখন নরনারীর চোখে এই ধরিত্রী সুন্দরী সাজে—এর শব্দ গন্ধ রূপ রস সবার চাইতে লোভনীয় মোহনীয় হ'য়ে উঠে—যখন কিশোর-কণ্ঠে আনন্দ কলরব সহজ, যখন কিশোরী-গণ্ডে দুর্লভ সরম-রক্তিমা দুর্লভ নয়, আমার সেই বয়সে সব নিরর্থক হ'য়ে উঠ্‌ল। পৃথিবী যে হাজার বাহু দিয়ে নরনারীকে আলিঙ্গন করে' আছে এর কোন আলিঙ্গনই আমাকে ধর্‌তে পার্‌ল না।

এই যে বিরাট মহানগরী, এর আসুরিক হৃদ্-স্পন্দন, এর বিরামহীন চলচঞ্চল বিক্ষোভ—এ কেন? আমার বোঝবার সাধ্য নেই। ঐ যে নরনারী চলেছে—যান বাহন ছুটেছে—হাজার প্রমোদ ভবনে কি এক উন্মত্ত কলকল্লোল উঠেছে—এ একটা দারুণ

বিভীষিকা! এই বিভীষিকা থেকে আমার নিস্তার নেই। অথচ এই নিস্তারের পথ খুঁজে' বের করতেই হবে। এই রূপময়ী পৃথিবীকে আমি আমার কাছ থেকে হটিয়ে দিতে পারিনে—এ যেন চারিদিক থেকে তার লক্ষ বাহু দিয়ে জ্বলন্ত আঙুলের মুঠোয় আমাকে ধরতে আসে—এ যেন তার বিরাট মুখব্যাদান করে' আমাকে গ্রাস করতে আসে—সেই মুখের ভিতর দিয়ে আমার চোখে পড়ে তার বিরাট জঠরের গহ্বর, কি কালো কি মসীময় সে গহ্বর!—আর সেইখান থেকে শোনা যায় কি ছন্দহীন বিকট কোলাহল, গণ্ডগোল, চীৎকার—কোটী কোটী নর নারী বালক বৃদ্ধ যুবা একেই বলে আমোদ সুখ স্ফূর্তি—একেই বলে মহোৎসব। হায় রে অন্ধ! হায় রে বধির!

এ থেকে আমার নিস্তারের পথ খুঁজে বের করতেই হবে, নইলে পাগল হ'য়ে যাব। এই সংসারকে আমি হটিয়ে দিতে পারি নে—কিন্তু এ থেকে ত আমি আমাকে সরিয়ে নিতে পারি। এর একমাত্র উপায় মৃত্যু। আমার মনে জেগে উঠ্‌ল আত্মহত্যার কথা। মানুষ জীবনের নামে লাফিয়ে ওঠে—আমি মৃত্যুর নামে নেচে উঠ্‌লুম। মৃত্যু, সে ত আমার পক্ষে বিভীষিকা নয়—সে আমার পরম মুক্তি—আমার যন্ত্রণার পরম অবসান। মনস্থ কর্‌লুম আত্মহত্যা কর্‌ব—মনস্থ করেই জীবনটা একেবারে হাল্‌কা হ'য়ে গেল।

২

এখন প্রশ্ন জাগ্‌ল আত্মহত্যা কর্‌ব কি উপায়ে ?

ধরতে গেলে এক মুহূর্ত্তের কাজ! রাইফেল কেস থেকে রাইফেল্‌টা বের করা, তা'তে একটা বাঘমারা টোটা ভরা, তারপর তার নলটা মুখের মধ্যে রেখে পায়ের আঙুল দিয়ে ঘোড়া টেনে দেওয়া; বাস—পাঁচ মিনিটও লাগে না।

কিন্তু তারপর? লোকে এসে দেখ্‌বে অতনুপ্রসাদের প্রাণহীন দেহ—অতনুপ্রসাদ ক্রোড়পতি পৃথ্বীপ্রসাদের একমাত্র উত্তরাধি-কারী—দেখ্‌বে তার চিক্কণ কুঞ্চিত কেশের সঙ্গে মাথার ঘি রক্ত মিশে একটা বিশ্রী ন্যক্কারজনক ব্যাপার হয়েছে—হয় ত তার গাল দুটো উড়ে গিয়ে দু'দিকের চোয়াল মাড়িসুদ্ধ দাঁত নিয়ে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে—না না সে বিশ্রী দৃশ্য—কিছুতেই নয়—অতনুপ্রসাদের শেষ মূর্ত্তি জগতের চোখে ঐ কদর্য্য আকারে কিছুতেই ধর্‌তে পার্‌ব না—হায় মানুষ মর্‌তে ভয় পায় না—ভয় পায় তার অহমিকার অবমাননাতে।

তারপর আছে বিষ। দেশী বিলিতি কত রকমের ক[illegible] আকারের বিষের কোনটাই আমার পক্ষে সংগ্রহ করা অ[illegible] নয়। কিন্তু বিষের জ্বালা—বিষ যখন স্নায়ুতে স্নায়ুতে রক্ত বিন্দুতে বিন্দুতে তার ক্রিয়া আরম্ভ করে, তখন সে কি দারুণ যন্ত্রণা। মৃত্যু আমার কাছে কাম্য আনন্দের—কিন্তু দৈহিক যন্ত্রণা আমার কাছে একটা ভীষণ বিভীষিকা। আমি মৃত্যু চাই কিন্তু

দৈহিক যন্ত্রণাকে এড়িয়ে—সব সহ্য কর্‌তে পারি কেবল পারি না শরীরের কষ্ট।

এমনি একটা বিষ কি পাওয়া যায় না যাতে যন্ত্রণা নেই যা জীবন হরণ কর্‌বে অতি ধীর, অতি ধীর, অতি ধীরে ধীরে—সপ্তাহ পক্ষ মাস ভরে আমি জান্‌ব যে আমি মর্‌ছি পলে পলে তিলে তিলে—মৃত্যু আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে এই অনুভূতি স্পষ্ট করে' উপলব্ধি কর্‌ব প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেণ্ডে। জীবনের অনুভূতিই আমার কাছে বেদনাময়, মৃত্যুর অনুভূতি আমার কাছে কাম্য অমৃত। তেমন মৃত্যু দান করতে পারে এমন বিষ কি এই জগতে নেই? অবশেষে যা খুঁজছিলুম তাই পেলুম, আমার মৃত্যুর উপায় দৈবই আমার কাছে এনে দিলে।

৩

তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার দারজিলিংএ—একটী সাপুড়ে—একটী পাহাড়ী।

সে আমাকে সাপখেলা দেখাতে এসেছিল। কথায় কথায় তার সঙ্গে আলাপ সুরু কর্‌লুম। কথায় কথায় তার কাছ থেকে শুন্‌লুম যে তিব্বতী লামাদের কাছে এক রকম বিষ আছে যার ক্রিয়া খাওয়ার চারদিন পরে আরম্ভ হয় এবং পনর দিন পরে যে খায় সে তার ক্রিয়া টের পায়; শরীর একটু ঝিম্ ঝিম্ করে—একটা নেশার মত, তারপর একমাস থেকে দু'মাসের মধ্যে মৃত্যু;

অথচ কিছুমাত্র জ্বালা যন্ত্রণা নেই। সুধু একটু আরামদায়ক ঝিমঝিমানি।

আমি লাফিয়ে উঠলুম—এই ত ঠিক আমি যা চাই! কোন যন্ত্রণা নেই—ছুমাস ধরে' আমি জানব যে আমি মরছি ধীরে ধীরে পলে পলে তিলে তিলে—অনিবার্য্যরূপে অব্যর্থরূপে মৃত্যুর দিকে মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছি—এই ত আমি যার অনুসন্ধান এত দিন করছিলুম। বলা বাহুল্য এর পর এক মাসের মধ্যে ঐ বিষ আমার হস্তগত হ'ল।

আমি কল্‌কাতায় ফিরলুম। আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে জীবিত একমাত্র মামা। মনে করলুম এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার আগে একবার তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করব। ঠিক করে' সেই দিনই মামার কাছে রাঁচি যাত্রা করলুম।

৪

রাঁচিতে শামলংএ মামার বাসস্থানে পৌঁছলুম। পৌঁছে দেখি গেট বন্ধ, তালা লাগান। রেলিংএর ফাঁকে দেখলুম বাগানের ফুলগাছ গুলো কত দিনের আগাছায় ঢেকে গেছে। বাড়ীর দরজা জানালা সব বন্ধ। যেন কতকালের পোড়ো বাড়ী।

তৎক্ষণাৎ আমি শিবেন্দুবাবুর খোঁজে চললুম। শিবেন্দুবাবুর বাড়ীতে যখন পৌঁছলুম তখন তিনি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমাকে দেখে তাঁর চোখের চশমা জোড়াটা কপালে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনার নাম?"

—"আজ্ঞে আমি অতনুপ্রসাদ—মরুত বাবুর—"

হাতের কাগজখানা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন—বল্‌লেন—"ওঃ তুমি অতনুপ্রসাদ, মরুত বাবুর ভাগ্নে—আমি চিন্‌তেই পারি নি—সেই দশ বছর আগে একবার দেখা—তখন তুমি—"

আমি জিজ্ঞেস কর্‌লুম—"মামা কোথায় ?"

শিবেন্দুবাবু আমার অতীত ইতিহাস ক্ষান্ত দিয়ে বল্‌লেন—"বোস, সব বল্‌ছি।"

আমি বস্‌লুম। শিবেন্দুবাবু অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। চারিদিক হঠাৎ যেন নিস্তব্ধতায় ভরে' গেল। কেবল ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ। কোথায় একটা গোরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ আওয়াজ। বহুদূর থেকে একদল কোল রমণীর গানের সুর ভেসে আস্‌ছে।

শিবেন্দুবাবু একটু ভেবে নিয়ে বল্‌তে সুরু কর্‌লেন—"সে প্রায় আড়াই বছরের কথা—জানই ত এমন দিন ছিল না যে মরুতবাবু সন্ধ্যাবেলায় একবার আমার এখানে দেখা দিয়ে না যেতেন—কিন্তু হঠাৎ তাঁর আসা বন্ধ হ'য়ে গেল। একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন যায় তাঁর আর কোন দেখা নেই। তারপর লোকমুখে শুন্‌লুম যে কয়েকদিন হ'ল মরুতবাবুর ওখানে এক সন্ন্যাসী এসেছেন সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে মরুতবাবু রাত-দিন ঘর বন্ধ করে' কি ক্রিয়া-ট্রিয়া করেন। কিছু-দিন পরে সন্ন্যাসী চলে' গেলেন। এর পর প্রায় মাসখানেক কেটে

গেল। একদিন ভোর বেলায় মরুতবাবুর চাকর এসে হাজির—দেখ্‌লুম সে অত্যন্ত ঘাবড়ে গেছে। সে বল্‌লে বাবু যেন কেমন-কেমন—আমি গিয়ে যদি একবার দেখে আসি।

তৎক্ষণাৎ আমি মরুতবাবুর ওখানে চল্‌লুম। গিয়ে আমি যা দেখ্‌লুম তা'তে একেবারে ভয় পেয়ে গেলুম।

দেখ্‌লুম মরুতবাবু একটা চেয়ারে বসে' আছেন। তাঁর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে মেরে গেছে—চোখ দুটো অস্বাভাবিক ভাবে বড় বড় আর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে—চোখে মুখে একটা দারুণ ভীতির চিহ্ন আঁকা। আর সবার চাইতে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে তাঁর এক হাতে একটা ঘড়ি আর এক হাতে একখানি আয়না! ক্রমাগত তিনি একবার ঘড়ির দিকে আরবার আয়নার দিকে দেখ্‌ছেন—আর বল্‌ছেন, কেবল বল্‌ছেন—'কাট্‌ছে, কাট্‌ছে, দাগ কাট্‌ছে—প্রতি মিনিট, প্রতি সেকেণ্ডে দাগ কাট্‌ছে।' আমি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার সাহেবের কাছে লোক পাঠালুম। ডাক্তার সাহেব এসে পরীক্ষা করে' বল্‌লেন—Completely lost his reason—মরুত বাবু পাগল হ'য়ে গেছেন।"

শিবেন্দুবাবু থাম্‌তেই আমি জিজ্ঞেস কর্‌লুম—"তারপর?"

—"তারপর সব বন্দোবস্ত করে' মরুতবাবুকে কাঁকে পাঠিয়ে দিলুম—সেই থেকে তিনি পাগ্‌লা গারদেই আছেন। কিছুদিন আগে একবার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। দেখ্‌লুম অবস্থা আরও খারাপ। এখন ঘড়ি আয়না ত আছেই আবার মাঝে মাঝে চীৎকার করে' ওঠেন—যেন তাঁর সাম্‌নে কে একটা বিরাট

অতল কালো গহ্বর কেটে রেখেছে, আর সেই গহ্বরে কে যেন তাঁকে টেনে নিচ্ছে। সে কি ভীষণ চীৎকার—নৌকোডুবিতে আমি একবার এম্‌নি চীৎকার শুনেছিলুম।"

ঠিক্ হ'ল সেদিন বিকেলে মামাকে দেখ্‌তে যাব।

৫

যখন পাগলাগারদে পৌঁছলুম তখন পাহাড়ের মাথায় মাথায় রোদ মোলায়েম হ'য়ে এসেছে।

সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট এসে আমাদের মামার ঘরে নিয়ে গেলেন।

আমরা মামার ঘরে ঢুকতেই—উঃ সে কি চীৎকার—একটা হৃদয়-চেরা চীৎকার করে' মামা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন—কি দারুণ ভীতি চোখ দুটোতে—সেই চোখ দুটো কোন এক অদৃশ্য বস্তুর দিকে নিবদ্ধ করে' বল্‌তে লাগ্‌লেন—"গেলুম, গেলুম, পড়লুম, উঃ কি অন্ধকার গহ্বর"—মামা কেবলই কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। পাঁচ মিনিটের পর যেন তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হলেন। তারপর বসে' পড়ে এক হাতে ঘড়ি আর হাতে আয়না নিয়ে একবার এটা একবার ওটা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন আর কেবল বল্‌তে লাগ্‌লেন—"কাট্‌ছে, কাট্‌ছে, দাগ কাট্‌ছে, কেবলই দাগ কাট্‌ছে—প্রতি মিনিট, প্রতি সেকেণ্ডে।"—ঠিক যেমন শিবেন্দুবাবু বলেছিলেন।

এক নিমিষে আমার চোখের সাম্‌নে থেকে আমার হৃদয়ের উপর থেকে একটা পর্‌দা খসে' পড়ল। পাগল? কে পাগল?

মামা ?—না, না, না,—পাগল ঐ সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট, শিবেন্দুবাবু, আমি, তুমি—সবাই পাগল। মামাই কেবল প্রকৃতিস্থ, প্রকৃত সত্যের অনুভূতি কেবল মামাই যে পেয়েছে। দাগ কাট্‌ছে—কাট্‌ছেই ত! প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেণ্ডে মুখে হাতে পায়ে সর্ব্ব দেহে প্রতি নিমিষে দাগ কাট্‌ছে মৃত্যুর দূত, আর ঐ অতল অন্ধকার গহ্বর মৃত্যুর অজ্ঞাত ক্রোড়; হায় রে হায়? পাগলরা মিলে সত্যদ্রষ্টাকে পাগ্‌লা গারদে পুরেছে।

আমার অন্তরটা আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌ল—স্নায়ুতে স্নায়ুতে শোণিত প্রবাহ চন্‌ চন্‌ করে' উঠ্‌ল। পেয়েছি পেয়েছি—ঐ যে সত্য—ঐ যে মৃত্যুর অনুভূতি—আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে মর্‌ছি, জীবন ভরে' আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি এই সত্য যদি আমি আমার অন্তরে সত্য করে' তুল্‌তে পারি তবে সে কি সুখ, সে কি আনন্দ, সে কি জীবন ভরে' মুক্তির আস্বাদ। যে সত্য আমার মামা অনিচ্ছায় পেয়েছেন সেই সত্যকে আমায় সাধন করে' সত্য করে' তুল্‌তে হবে।

আমি কল্‌কাতায় ফিরে এলুম, এসেই সর্ব্বপ্রথমে আমার সংগ্রহ করা বিষ দূরে নিক্ষেপ করলুম। তারপর আমার সমস্ত ইচ্ছা-শক্তিকে নিয়োগ কর্‌লুম ঐ সত্যকে আমার অন্তরে সত্য করে' তুল্‌তে; দু'মাস পরে' আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হ'ল।

আমি আজও বেঁচে আছি। কিন্তু আর দুঃখ নয়, বেদনা নয়—প্রতি মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করে' করে' চল্‌ছি—আমি চল্‌ছি—চল্‌ছি—ধীরে ধীরে—অনিবার্য্য ভাবে—

অব্যর্থ ভাবে—মৃত্যুর দিকে মুক্তির দিকে—এই আমার জীবন ভরে' পরম আত্মহত্যা।

জীবন আর তার মিথ্যা অস্তিত্ব নিয়ে আমাকে বেদনা দিতে পারে না।

শাস্ত্র-রচনা

প্রক্ষিপ্ত-দেশের শাস্ত্রকারেরা দেশের চারিদিকে আঁক টেনে বল্‌লেন—এই আমাদের গণ্ডী, এর বাইরে যা, সব ম্লেচ্ছ দেশ—আমাদের অস্পৃশ্য।

রাজা ধর্ম্মকেতু বল্‌লেন—হাঁ এই আমাদের গণ্ডী।

নাগরিকেরা বল্‌লে—হাঁ এই আমাদের গণ্ডী।

জনপদবাসীরা বল্‌লে—হাঁ এই আমাদের গণ্ডী।

সেদিন থেকে প্রক্ষিপ্ত-দেশের সমাজ গড়ে' উঠ্‌ল ঐ গণ্ডীর মাপে মাপে।

২

সুমেরু দেশের রাজা অক্লান্তবর্ম্মা বেরিয়েছেন পৃথিবী জয়ে। সপ্তদ্বীপ জয় করে' তিনি এসে পড়্‌লেন প্রক্ষিপ্ত-দেশের সীমান্তে।

রাজা ধর্ম্মকেতু শঙ্কিত হলেন।

শাস্ত্রকারেরা এসে বল্‌লেন—মহারাজ কোন ভয় নেই, আমাদের গণ্ডী সুস্পষ্ট করে' টানা আছে।

নাগরিকেরা এসে বল্‌লে—মহারাজ যুদ্ধ-সজ্জা কই?

শাস্ত্রকারেরা ভীত হ'য়ে বল্‌লেন—সর্ব্বনাশ সুমেরু-রাজের সঙ্গে যুদ্ধ!—ওরা যে অন্ন গ্রহণ করে না,—যবচূর্ণ ওদের খাদ্য, যবচূর্ণ আমাদের অস্পৃশ্য।

নাগরিকেরা বল্‌লে—তবে কি হবে?

শাস্ত্রকার বল্‌লেন—কোন ভয় নেই, গণ্ডী আমাদের সুস্পষ্ট।

৩

সীমান্তে দাঁড়িয়ে রাজা অক্লান্তবর্ম্মা হাঁক দিলেন—যুদ্ধং দেহি।

শাস্ত্রকারেরা তাঁর সম্মুখীন হ'লেন—বল্‌লেন—ম্লেচ্ছরাজ সাবধান, এই আমাদের গণ্ডী।

অক্লান্তবর্ম্মা বল্‌লেন—এ তোমার গণ্ডী, আমার নয়।

শাস্ত্রকারেরা বল্‌লেন—সে কি মহারাজ! এ কি সুধুই আমার গণ্ডী—এ গণ্ডী সত্য, সনাতন।

রাজা উত্তর দিলেন—এ গণ্ডী যদি সত্য সনাতন হয়, তবে সনাতন সত্য একে রক্ষা করুক।

শাস্ত্রকার বল্‌লেন—ম্লেচ্ছরাজ আপনি শাস্ত্র মানেন না।

অক্লান্তবর্ম্মা বল্‌লেন—মানি, সে শাস্ত্র আমার জীবনের পাতে লেখা আমার বক্ষ-রক্তে।

শাস্ত্রকারেরা বল্‌লেন—মহারাজ আপনি ধর্ম্ম মানেন না।

দিগ্বিজয়ী বল্‌লেন—মানি—আমার সেই ধর্ম্ম প্রক্ষিপ্তরাজকে আমার পদানত করায় নিযুক্ত করেছে।

শাস্ত্রকার বল্‌লেন—সাবধান অক্লান্ত বর্ম্মা—

ম্লেচ্ছরাজ বল্‌লেন—সেনাপতি এই মূঢ়দের বন্দী কর।

৪

রাজা ধর্ম্মকেতুর কাছে সংবাদ পৌঁছল সুমেরুরাজ তাঁর শাস্ত্রকার-দের বন্দী করেছেন আর সেই শাস্ত্রকারদের আঁকা গণ্ডী অতিক্রম করেছেন তাঁর চতুরঙ্গবাহিনী নিয়ে।

চারিদিকে মহা কোলাহল পড়ে গেল—কেবল ভয় ত্রাস আর বিশৃঙ্খলা।

তারপর সপ্তদিবস ধরে' সুমেরুরাজ্যের সৈন্যবাহিনী ধর্ম্মকেতুর রাজধানী লুণ্ঠন কর্‌ল।

রাজা অক্লান্তবর্ম্মা ধর্ম্মকেতুকে বল্‌লেন—প্রক্ষিপ্তরাজ, আমি সসাগরা পৃথিবীর রাজ-চক্রবর্ত্তী। তুমি আমার সামন্ত।

রাজা ধর্ম্মকেতু বল্‌লেন—মহারাজ আমি আপনার আশ্রিত।

অক্লান্তবর্ম্মা নিজ রাজধানীতে ফিরে এলেন। যাবার সময় সেনাপতিকে আদেশ কর্‌লেন—সেনাপতি বন্দী শাস্ত্রকারদের ত্যাগ কর। সুমেরুরাজ্যে ওদের কোন প্রয়োজন নেই।

শাস্ত্রকারেরা মুক্তি পেলেন।

৫

রাজা ধর্ম্মকেতু সিংহাসনে বসেছিলেন। শাস্ত্রকারেরা তাঁর সমীপে এসে অবনত মস্তকে দাঁড়ালেন। বল্‌লেন—মহারাজ ভুল হয়েছে।

রাজা বল্‌লেন—হাঁ হয়েছে।

নাগরিকেরা এসে বল্‌লে—হাঁ হয়েছে।

জনপদবাসীরা এসে বল্‌লে—হাঁ হয়েছে।

শাস্ত্রকারেরা বল্‌লেন—এবার আর কোন গণ্ডী নয়। আকাশের মেঘমালা আমাদের গণ্ডী—সাগরের নীলরেখা আমাদের সীমান্ত। এবার বসুধৈবকুটুম্বকম্।

রাজা বল্‌লেন—এবার বসুধৈবকুটুম্বকম্।

নাগরিকেরা বল্‌লে—বসুধৈবকুটুম্বকম্।

জনপদবাসীরা বল্‌লে—বসুধৈবকুটুম্বকম্।

৬

কুমেরু দেশের অধিপতি বর্ব্বররাজ অক্ষৌহিণী সহচর নিয়ে তাঁর রাজ্য থেকে বেরিয়েছেন। দক্ষিণের ইলাদেশ, সপ্তনদ, পঞ্চকর্ণী, ত্রিবঙ্কম্ রাজ্য লুণ্ঠন করে' প্রক্ষিপ্তদেশে এসে পড়্‌লেন।

শাস্ত্রকারেরা রাজ-প্রাসাদে গিয়ে বল্‌লেন—মহারাজ, বর্ব্বররাজ দেশ লুণ্ঠন কর্‌তে আস্‌ছে। সৈন্য সংগ্রহ করুন।

রাজা ধর্ম্মকেতু নাগরিকদের ডাক দিলেন—বল্‌লেন—বর্ব্বররাজ আস্‌ছে—দেশরক্ষায় প্রস্তুত হও।

নাগরিকেরা আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—দেশ? কোথায় দেশ? বসুধৈবকুটুম্বকম্।

রাজা বল্‌লেন—তোমাদের ধনরত্ন লুণ্ঠিত হবে।

নাগরিকেরা বল্‌লে—আমরা ধনরত্ন নিয়ে পরাক্রান্ত যবন-রাজের আশ্রয় নেব।

প্রক্ষিপ্তরাজ জনপদবাসীদের আহ্বান কর্‌লেন—বল্‌লেন—বর্ব্বররাজের হাত থেকে দেশ রক্ষা কর।

জনপদবাসীরা বল্‌লে—দেশ? কার দেশ? বসুধৈবকুটুম্বকম্‌।

রাজা বল্‌লেন—তোমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হবে।

জনপদবাসীরা উত্তর দিলে—সম্পত্তি আমাদের ভূমি, তা কি করে' লুণ্ঠিত হবে?

বর্ব্বররাজ এসে রাজা ধর্ম্মকেতুর রাজকোষ শূন্য করে' অবন্তী রাজ্যের দিকে চলে' গেলেন।

৭

শাস্ত্রকারেরা এসে বল্‌লেন—মহারাজ আবার ভুল হয়েছে।

রাজা বল্‌লেন—হাঁ হয়েছে।

নাগরিকেরা জনপদবাসীরা বল্‌লে—হাঁ হয়েছে।

শাস্ত্রকারেরা বল্‌লেন—মহারাজ আবার নবশাস্ত্র রচনা কর্‌তে হবে। গণ্ডী ও মুক্তির বিরোধ নয়—চাই তাদের মিলন। চাই এমন শাস্ত্র গণ্ডী যেখানে মুক্তিকে সহজ কর্‌বে—মুক্তি যেখানে গণ্ডীকে সত্য কর্‌বে।

রাজা বল্‌লেন—হাঁ ঠিক্‌।

নাগরিকেরা জনপদবাসীরা সমস্বরে বলে' উঠ্‌ল—হাঁ এইবার ঠিক্‌।

রাজা ধর্ম্মকেতুর রাজ্যে এ শাস্ত্র আজও চল্‌ছে।

গৌরীদানের ফল

সনাতন চাটুয্যে অতি তুখোড় লোক, এমন পলিসিবাজ আর দুনিয়ায় দুটো হয় না। তবে সাধারণত দেখা যায় লোকে পলিসি খাটায় ইহলৌকিক ব্যাপারে, কিন্তু সনাতন খাটাতেন পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে। বলা বাহুল্য বোধ হয়, এই পারলৌকিক ব্যাপার সব পরার্থে উদ্দীপনাজনিত নয়, নিজস্বার্থে উৎসাহজনিত। সনাতনের জ্ঞান হওয়া থেকে বরাবর দৃষ্টি ছিল যে স্বর্গটা কিছুতেই যেন হাত ছাড়া হ'য়ে না যায়। তাই স্বর্গে যাবার যত রকম কায়দা সংস্কৃতে লেখা আছে তা ছিল সনাতনের কণ্ঠাগ্রে ও নখাগ্রে। গয়া গঙ্গা গদাধর কারোই, রঘুনন্দন চাটুয্যের পৌত্র ও পরাশর চাটুয্যের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সনাতন চাটুয্যের বিরুদ্ধে কোনই অভিযোগ বা অনুযোগ করবার কিছুই ছিল না। আর সেই জন্যে সনাতন ভাব্‌তেন যে আর সবাইকে যদি বৈতরণী পার হ'তে হয় সাঁতরে, তবে তাঁর জন্যে তৈরী হ'য়ে থাকবে অন্ততপক্ষে একটি ময়ূরপঙ্খী, খুব কম করে' হলেও এক শ' দাঁড়ের। সনাতনের মনে যে অধিকতর দ্রুতগামী ষ্টীমলঞ্চ বা মোটরলঞ্চের কথা উঠ্‌ত না, তা নয়। তবে একালের ম্লেচ্ছের আবিষ্কারগুলো সেকালের

ব্রাহ্মণ ইঞ্জিনিয়ারের আবিষ্কৃত বৈতরণীর বুকে চল্‌বে কি না সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহের বিরাম ছিল না।

সনাতনের বনে যাবার বয়েস ধর ধর, এমন সময় একদিন তাঁর মনে হ'ল যে, স্বর্গে যাবার সব রকম পুণ্যের টিকিটই তাঁর সংগ্রহ করা হ'য়ে গেছে, সুধু গৌরীদানের পুণ্যের টিকিটখানিই কেনা হয় নি। সেই বয়সে এই কথাটা সনাতনের মনে হওয়ার একটা কারণও ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে, সেই সময়ে তাঁর সবার ছোট মেয়েটি সাত পেরিয়ে ঠিক আটে পা দিয়েছে। সনাতনের বয়সটাও ধাঁ ধাঁ করে' এগিয়ে যাচ্ছে। তাই সনাতন মনে মনে বল্‌লেন—না গৌরীদানের পুণ্যটা বাকি রাখা কোন কাজের কথা নয়।

সনাতনের যে কথা সেই কাজ। বছর ফির্‌তে না ফির্‌তে বিধবা তারা সুন্দরীর একমাত্র পুত্র রমেনের সঙ্গে তাঁর ছোট মেয়ে লতিকার শুভবিবাহটা সুসম্পন্ন করে' স্বর্গে যাবার সনন্দখানি একেবারে মনের পকেটে পূরে রাখলেন।

২

রমেন ছিল বিধবা তারাসুন্দরীর একমাত্র ছেলে। তেইশ বছর বয়সে দু' দু' বার বি-এ ফেল করে' বাড়ীতেই বসে' ছিল। সুতরাং এই সুযোগে মা ছেলের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধু ঘরে আন্‌লেন।

বিবাহ ইত্যাদির সম্বন্ধে রমেনের যে মতামত কি ছিল তা কেউ জান্‌ত না, তবে কিছুদিন থেকে যে সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক

ভাবে গুণ্ গুণ্ করে' রবিবাবুর বাছা বাছা প্রেমসঙ্গীতগুলোর মক্স করত, সেটার সম্বন্ধে কেউ কেউ সাক্ষী দিতে পারত। তা ছাড়া বার্ণস্ ও ব্রাউনিং-এর কোন কোন লাইন যে তার হৃদয়টা দুলিয়ে যেত না সেটাও কেউ নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারে না।

সুতরাং এ-হেন রমেনের শয্যাপ্রান্তে যেদিন তার অষ্টম বর্ষীয়া বধূটি এসে একটি কাপড়ের পুঁটুলির মত হ'য়ে স্থান গ্রহণ করল সেদিন রমেনের হৃদয়টা তোলপাড় করে' উঠল অনেকখানি। তারপর তার হৃদয়ের রক্ত তার মাথার দিকে এবং মাথার রক্ত তার হৃদয়ের দিকে অনেকবার যাতায়াত করার পর যখন সে সাহস সঞ্চয় করে' নববধূর একটি হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে আবেগকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—"লতি, আমায় ভালবাসবে?" তখন সে আবিষ্কার করল যে লতি অবগুণ্ঠনের নীচে কাঁদছে। সে প্রশ্নে লতির কান্না দ্বিগুণ বেড়ে গেল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে লতি উত্তর দিলে—"মা ছাড়া আর আমি কাউকে ভালবাসব না।" রবীন্দ্রনাথ, বার্ণস, ব্রাউনিং, সব জড়িয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে রমেনের বুকের মধ্যে এমনি একটা জমাট আঁধার বেঁধে উঠল যে, তার মধ্যে রমেনের নিজের মন বুদ্ধি ও চিত্ত একেবারে লয় পেয়ে গেল, রইল যা তা কেবল ফিউচারিষ্টদের একখানা জোরাল ছবি।

৩

তার পর দিন রমেনের হঠাৎ সুবুদ্ধির উদয় হ'ল। রমেন মাকে বল্‌লে—"মা আজকাল যে রকম দিন পড়েছে তা'তে আর যেটুকু

জমি-জমা আছে তা'তে চল্‌বে না। সুতরাং চাকরি-বাকরির চেষ্টায় বেরিয়ে পড়া সমীচীন।" মায়ের অনেক অনুযোগ অভিযোগ ও অশ্রুজল হেলায় জয় করে' রমেন অতি দূরদেশে বীরভূমে তার এক দূর সম্পর্কিত চাকুরে-কাকার কাছে চলে' গেল।

কাকা মহাশয় রমেনের এই রকম হঠাৎ চাকরি কর্‌বার মত-মতি দেখে যুগপৎ পুলকিত ও আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। কাকা মহাশয়ের সাহেব-সুবোর কাছে একটু প্রতিপত্তি যে না ছিল তা নয়। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই রমেনের চল্লিশ টাকা মাইনের এক কেরাণীগিরি জুটে গেল।

চাকরী পেয়ে রমেন মাকে জানাল। মা লিখলেন, "বৌকে নিয়ে যা।" রমেন উত্তরে লিখ্‌ল, "মাইনে একটু বাড়ুক।" মা লিখ্‌লেন, "পুজোর বন্ধে বাড়ী আসিস্‌।" রমেন লিখ্‌ল, "এত দূরদেশ থেকে বাড়ী যেতে-আস্‌তে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ টাকা খরচ। ঐ বাজে খরচটা এখন না করে' টাকাটা জমিয়ে রাখ্‌লে ভবিষ্যতে কাজ দেবে।" এতে মায়ের যে কতদিন কতখানি অশ্রু ঝর্‌ল তা রমেনের অজ্ঞাত রয়ে গেল।

দেশে অনেকগুলো কল আছে। যেমন টাঁকশাল, বিশ্ব-বিদ্যালয়, ওকালতি, কেরাণীগিরি। এই সব কল থেকে এক একটা টাইপ তৈরী হয়। টাঁকশালে যেমন যে ধাতুই গলিয়ে দেওয়া যাক্‌ না কেন, তার একদিকে রাজার মুখের ছাপ আর একদিকে সন-তারিখ নিয়ে চেপ্টা হ'য়ে বেরিয়ে আসে, কেবল তাদের বাজারে একটু মূল্যের বেশী কম নিয়ে, তেমনি কেরাণীগিরির

কলে যত রকম ধাতুর মানুষই ঠেলে দেওয়া যাক্ না কেন কিছু দিন পরে তাদের হাব ভাব ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষ মন দেহ প্রায় এক রকমই দাঁড়ায় ; তবে বাজারদরে প্রভেদ থেকে যায়।

আটটি বছরে রমেন পাকা কেরাণী হ'য়ে উঠেছে। সে যে একদিন রবিঠাকুরের প্রেমসঙ্গীত গুন্‌গুন্ করে' গান কর্‌ত তা আজ-কাল তাকে দেখ্‌লে কেউ বিশ্বাস কর্‌বেনা। বার্ণস-এর নাম শুনলে আজ তার মনে হয় ও-পদার্থ টা স্কট্‌ল্যাণ্ডের পাহাড় কি অন্তরীপ কি ওমনি একটা কিছু হবে। আট বছরের প্রতিদিন, ঘণ্টা আষ্টেক করে' কলম পিষে তার দু চোয়াল জেগে উঠেছে, চক্ষু দুটো ভিতরে নেমে গেছে, একত্রিশ বছর বয়সে এমন কি তার বাঁ কানের পাশ দিয়ে দুটো পাকা চুল পর্য্যন্ত ঝুলে' পড়েছে। কিন্তু রমেন বেশ আছে, চল্লিশ থেকে তার মাইনে ষাটে উঠেছে।

এমন সময় এক দিন বিধবা তারাসুন্দরী লতিকাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের রাইচরণ খুড়োর সাথে রমেনের কর্ম্মস্থলে এসে উপস্থিত। রমেন মনে ভাব্‌লে মন্দ কি, এইবার খাওয়া-দাওয়ার একটু সুরাহা হ'তে পারে।

রমেন প্রায়ই আপিসের খাতাপত্র নিয়ে এসে বাসায় কাজ কর্‌ত। সেদিনও রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে' এসে নিজের শোবার ঘরের টেবিলের উপরকার বাতিটা উজ্জ্বল করে' দিয়ে চেয়ারে বসে' রাশি রাশি টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব একমনে দেখে যাচ্ছিল, এমন সময় খাওয়া শেষ করে' তার ষোড়শী স্ত্রী লতিকা ঘরে প্রবেশ কর্‌ল। লতিকার বয়েস যত বাড়্‌ছিল ততই

তার স্বামীর আট বছর আগের একমাত্র প্রশ্নটি তার হৃদয়ের অন্তস্তলে একটা তীক্ষ্ণ বিষাক্ত তীরফলকের মত স্থূল থেকে স্থূলতর হ'য়ে উঠ্‌ছিল। আজ সে এসেছিল তার সমস্ত মন প্রাণ নিয়ে একটি জীবনকে নিঃশেষে উজাড় করে' ঢেলে দেবার জন্যে। আজ লতিকার মনের সুষমা তার সমস্ত দেহে ছড়িয়ে গেছে, তার প্রাণের পুলক-স্পন্দন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চারিয়ে গেছে। ষোড়শী স্ত্রী এসে রমেনের চেয়ারের একটি হাতল ধরে' রমেনের পাশে দাঁড়াল, রাজ্যের রক্তিমাভা তার কপোলে জড়িয়ে। টাক-আনা-পাইয়ে ব্যস্ত রমেন একবার খালি মুখ তুলে চাইল, তারপর তার বাঁ কানের পাশে যেখানে দুটো পাকা চুল এসে ঝুলে পড়েছিল সেইখানে চুলের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে তার বাঁ হাতের পাঁচ আঙ্গুল চালাতে চালাতে বল্‌লে,—"আমাকে এখন আর disturb করো না, এ-কাগজ আমাকে কালই দাখিল কর্‌তে হবে।" লতিকার কপোলের রক্তিমাভা একমুহূর্ত্তে একেবারে পাঁশুটে হ'য়ে গেল, লতিকা ধীরে সরে' গেল। তার বুকের মধ্যে নেমে এল একটা জমাট বাঁধা আঁধার আর তার চোখের সাম্‌নে বিছিয়ে গেল একটা সীমাহীন শেষহীন নিষ্ঠুর মরুভূমি—যেখানে চারিদিকে কেবল বিরতিহীন মৃগতৃষ্ণিকা।

সেই সময়টাতে প্রায় ষাট বছরের এক বৃদ্ধ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে শুন্‌ছিলেন বৈতরণীর বুকে ময়ূরপঙ্খীর একশ' দাঁড়ের ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ।

স্বয়ম্বর

বহুকালের আগের কথা, গান্ধার-রাজ চক্রাধিপ, তাঁর কন্যা অপর্ণবা, তাঁরি কাহিনী।

রাজকুমারীর দেহের উপর দিয়ে ষোলটা বসন্ত ব'য়ে গিয়েছে। ষোল ষোলটা বসন্ত—তারি নিবিড় সোহাগ—সেই সোহাগের স্পর্শ রাজকুমারীর সারা দেহে। মাথায় চুল নয় ত যেন একরাশ চিক্-চিক্-করা কাকপক্ষ, একেবারে হাঁটুর নীচে এসে পড়েছে—চোখ নয় ত যেন দুটি পদ্মের পাপড়ি, একেবারে কান পর্য্যন্ত চলে' গিয়েছে—চোখের তারা নয় ত যেন আষাঢ়ের মেঘ তা'তে লুকোনো চক্-চক্-করা বিদ্যুৎ—বাহু নয় ত যেন মৃণাল—হাত নয় ত যেন সেই মৃণাল প্রান্তে ফোটা রক্ত-পদ্ম। গণ্ড গ্রীবা বক্ষ কটি জঙ্ঘা চরণ সব ষোল ষোলটা বসন্তের নিভৃত আদরে গড়ে' উঠেছে। ষোলটা ফাগুনের আগুন দিয়ে রাজকুমারীর সারা দেহ ঘেরা।

রাজমহিষী রাজাকে বল্লেন—মহারাজ, কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হবে।

গান্ধার-কুমারী স্বয়ম্বরা হবেন। দেশ-বিদেশে রাজাদের কাছে আমন্ত্রণ গেল। কাশী কাঞ্চি কোশল—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ—মৎস্য মগধ মিথিলা—চেদী চোল চালুক্য—শতরাজ্য থেকে শত

নৃপতি স্বয়ম্বর সভায় এসে বস্‌লেন। তাঁদের দেহের জ্যোতিতে অলঙ্কারের দ্যুতিতে চারিদিক উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। কত মণি মুক্তা মাণিক্য, কত চুনি পান্না মোতি। তাঁদের মাথায় মুকুট কর্ণে কুণ্ডল গলে মণিহার ললাটে চন্দনরেখা। শত নৃপতি যেন শত ইন্দ্রতুল্য।

সালঙ্কারা রাজকুমারী মালা হাতে স্বয়ম্বর সভায় এসে দাঁড়ালেন। রাজকুমারীকে দেখে শত নৃপতি মোহিত হ'য়ে গেলেন। কেউ কেউ আসনে প্রায় অচৈতন্য হ'য়ে পড়্‌লেন।

দ্বারপালিকার মুখে রাজাদের পরিচয় চল্‌তে লাগ্‌ল। ইনি কাশীরাজ, দেহে নবীন, জ্ঞানে প্রবীণ, দানে কর্ণ সমান—ইনি বঙ্গাধিপ, শৌর্য্যে সিংহতুল্য, করুণায় সিন্ধুসম—ইনি চেদীপতি, স্বয়ং কুবের যাঁর ধনভাণ্ডার রক্ষা করেন। এম্‌নি এম্‌নি পরিচয় দিয়ে দ্বারপালিকা রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। এক এক রাজার সাম্‌নে রাজকুমারী মালা হাতে দাঁড়ান আর সে রাজার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, চোখ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—তারপর রাজকুমারী যখন সেখান থেকে সরে' যান তখন যেন তাঁর মুখমণ্ডলে কে মসী ঢেলে দেয়, অঙ্গের রত্নরাজি যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে ওঠে—তাঁর হেট মাথা বক্ষের উপর লুটিয়ে পড়ে।

এমনি করে' রাজকুমারী শতেক নৃপতিকে অতিক্রম কর্‌লেন, কিন্তু কারো কণ্ঠেই তাঁর হাতের মালা পড়্‌ল না।

উজ্জ্বল দেব-সভা-তুল্য স্বয়ম্বর-সভা যেন সন্ধ্যার স্পর্শে ম্লান হ'য়ে উঠল। রাজপুরীর আনন্দভাব যেন নিবিড় আঁধারে ঢেকে গেল।

রাজকুমারী অন্তঃপুরে গিয়ে আপন কক্ষে অর্গল বন্ধ কর্‌লেন। শত নৃপতি অবনত মস্তকে যাঁর যাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন।

রাজা চক্রাধিপের বক্ষে, রাজমহিষীর অন্তরে একটা ক্রন্দন-রোল নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌ল।

রাজকুমারীর নির্জ্জন কক্ষে বিধাতাপুরুষ আবির্ভূত হলেন। বল্‌লেন—রাজকুমারি, তোমার মনস্তুষ্টির জন্যে আমি পৃথিবীর সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ শত নৃপতিকে একত্র কর্‌লুম কিন্তু সেই শত নৃপতির মধ্যে তুমি তোমার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেলে না! কি চাই তোমার?

রাজকুমারী কম্বুকণ্ঠ উন্নত করে' বল্‌লেন—মহান্! নারীর সার্থকতা কি কেবল পুরুষের গলগ্রহ হওয়ায়? ওর চাইতে মহত্তর আর কিছু কি নারীর জীবনে নেই?

বিধাতাপুরুষ জিজ্ঞেস কর্‌লেন—কি চাই তোমার?

রাজকুমারী বল্‌লেন—চাই আমি স্বাধীন জীবন।

বিধাতাপুরুষ জিজ্ঞেস কর্‌লেন—মূল্য দিতে পার্‌বে?

রাজকুমারী আগ্রহান্বিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—যে মূল্য হোক্ না আমি দিতে প্রস্তুত।

বিধাতাপুরুষ একটু হাস্‌লেন—বল্‌লেন—আচ্ছা।

২

রাজমহিষী স্বপ্ন দেখ্‌লেন। এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ এসে তাঁকে বল্‌ছেন—গান্ধার রাজমহিষি, রাজকুমারী অপর্ণবা সামান্যা নয়। তাকে পুত্রবৎ পালন কর্‌বে।

তার পরদিন রাজমহিষী স্বপ্নের কথা রাজাকে জানালেন। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ জিজ্ঞেস কর্‌লেন। মন্ত্রী বল্‌লেন—মহারাজ দৈবস্বপ্ন অনুসারে কাজ করাই কর্ত্তব্য—নইলে কে জানে কোন্ অমঙ্গল ঘট্‌বে। দৈব কি কাজের ভিতর দিয়ে কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে চায় তা আমরা মানুষ হ'য়ে কি বুঝ্‌ব?

সেই দিন থেকে রাজকুমারীকে শাস্ত্র ও শস্ত্র শিক্ষা দেবার জন্যে শাস্ত্রগুরু ও শস্ত্রাচার্য্য নিযুক্ত হলেন।

বছর ঘুর্‌তে না ঘুর্‌তে রাজকুমারী শাস্ত্র ও শস্ত্রে অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ কর্‌লেন।

রাজকুমারী যখন শাস্ত্রপাঠে বসেন তখন মনে হয় যেন কোন ব্রাহ্মণ সন্তান জ্ঞানার্জ্জনে ব্যস্ত। রাজকুমারী যখন অসিচালনা করেন—ধনুতে তীর যোজনা করেন তখন মনে হয় এ ত গান্ধার-রাজকুমারী নয় এ গান্ধার-রাজকুমার। রাজকুমারী যখন কর্ণে কুণ্ডল পরে' মাথায় শিরস্ত্রাণ দিয়ে দেহ কবচাবৃত করে'—তাঁর পৃষ্ঠে তূণ, হাতে ভল্ল, কটিবদ্ধ কৃপাণ নিয়ে তুরঙ্গম পৃষ্ঠে মৃগয়ায় যান তখন মনে হয় যেন শচীনন্দন জয়ন্ত।

এমনি করে' বছর দুই কেটে গেল। রাজকুমারী অপর্ণবার মনে ধীরে ধীরে একটা অস্বস্তি জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কি এ অস্বস্তি? কিসের জন্য এ অস্বস্তি? কি চাই রাজকুমারীর? রাজকুমারী ধরি' ধরি' করেও ধর্‌তে পারেন না। কেবল অস্বস্তি বেড়েই চলে।

দিনের পর দিন কাটে। বর্ষা আসে মেঘের ডমরু বাজিয়ে—শরৎ আসে সোনার আলোয় আকাশ ছেয়ে—হেমন্ত আসে তার

সন্ধ্যাকালের করুণ সুর নিয়ে, তার পাকা ধানের গন্ধ ছড়িয়ে—শীত আসে তার কুজ্ঝটিকা-ঘেরা রহস্য নিয়ে—বসন্ত আসে তার নবজীবনের গান নিয়ে, তার সবুজ প্রাণের চঞ্চলতা নিয়ে, তার ফুলের গন্ধ পাখীর গান রূপের নেশা নিয়ে। রাজকুমারীর অস্বস্তি কেবল বেড়েই চলে।

শাস্ত্রগুরু এসে চলে যায়, শস্ত্রাচার্য্য এসে ফিরে যায়, মৃগয়ার অশ্ব যেমনকার সাজান তেম্‌নি থাকে! রাজকুমারীর শাস্ত্রপাঠও ভাল লাগে না, শস্ত্রচালনাতেও প্রবৃত্তি হয় না, মৃগয়াতেও তৃপ্তি মেলে না। রাজকুমারীর যেন কি হয়েছে অথচ নিজেও জানে না যে কি!

এক একদিন রাজকুমারী স্বপ্ন দেখেন এই বিরাট সংসার কেবল একটা প্রকাণ্ড মায়ের মেলা। প্রত্যেক মায়ের কোলে এক একটি সুকুমার শিশু। মা ও শিশুর চোখে কি যেন একটা অত্যাশ্চর্য্য সুখের অঞ্জন টানা। কি একটা পরিপূর্ণ সার্থকতা—কি একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়ে শিশু ও মায়ের জীবনের বন্ধন-গ্রন্থি। রাজকুমারী স্বপ্নের অর্থ কিছু বুঝ্‌তে পারেন না। তাঁর অন্তরে কে যেন এক চিরজাগ্রত দেবীর মর্ম্মতল একটা ক্রন্দন-রোলে হু হু করে' ওঠে—শাস্ত্রব্যাখ্যায় ও শস্ত্রচালনায় যে দেবীর পূজা সমাপ্ত হয় নি! রাজকুমারীর অস্বস্তি আরও বেড়ে ওঠে।

এক একদিন রাজকুমারী স্বপ্ন দেখেন যে, নন্দন-কাননে একটা বিরাট শিশুদের হাট লেগেছে—লক্ষ লক্ষ শিশু সব, প্রত্যেক শিশুর পাশে এক একজন নারী। নারীর সমস্ত অন্তর যেন সেই

শিশুর পুলক-স্পর্শে পুলকিত—শিশুর কল-কণ্ঠ, শিশুর কল-হাসি, শিশুর সুকুমার স্পর্শের মধ্যে যেন নারী-অন্তরের অন্তিম রহস্য গোপন হ'য়ে ছিল। নারী-অন্তরের সমস্ত বেদনা মথিত করে' সমস্ত অমৃত মন্থন করে' যেন নবীন ঊষার সোনালী আলোরেখার মতো জীবন নিয়ে জেগে উঠেছে তরুণ সুকুমার শিশু। নারী-অন্তরের সমস্ত সুখ ও আনন্দ যেন শিশু-মূর্ত্তিতে শরীরী হ'য়ে উঠেছে। রাজকুমারীর অন্তরের অস্বস্তি অকূল হ'য়ে ওঠে।

এম্‌নি করে' দিন যায়। ধীরে ধীরে রাজকুমারীর সখিরা জান্‌ল, তারপর সখীদের কাছ থেকে রাজমহিষী জান্‌লেন, রাজমহিষীর কাছ থেকে রাজা শুন্‌লেন। রাজকুমারী যে স্বয়ম্বরা হবেন।

রাজা খুসী হলেন। মন্ত্রীকে স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন কর্‌তে বল্‌লেন। দেশ-বিদেশের রাজারা আমন্ত্রিত হলেন।

৩

সুসজ্জিত স্বয়ম্বর-সভা। মনোহর সুনীল চন্দ্রাতপ মণি মুক্তা খচিত—চারিদিকে স্বর্ণ সূত্রের ঝালর ঝুলে পড়েছে—দিকে দিকে পুষ্পমাল্য পল্লবগুচ্ছ—দিকে দিকে নিপুণ তুলিতে অঙ্কিত আলেখ্য। রামের হরধনুর্ভঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ, অর্জ্জুনের মৎস্য-চক্র ভেদ, এম্‌নি সব কত কত ছবি। স্বয়ম্বর-সভায় এক শত রত্নাসন। সেই শত রত্নাসনে আবার শত নৃপতি এসে বস্‌লেন।

সালঙ্কারা রাজকুমারী মালা হাতে দ্বারপালিকার সঙ্গে স্বয়ম্বর-সভায় এসে দাঁড়ালেন।

কে এ? কে এ কুমারী? এই কি গান্ধার-রাজকুমারী অপর্ণবা? সে মরালনিন্দিত গতি কই? সে রাজহংসীসদৃশ গ্রীবা-ভঙ্গী কই? সে মৃণালসদৃশ বাহু কই? করে সে রক্তপদ্ম কই? অধরপুটে সে কমলস্পর্শ কই? গণ্ডে সে নমনীয়তা কই? বক্ষে সে তরঙ্গভঙ্গ কই? কই কই? সে মন্মথ-মনোহারিণী লাবণ্য-ছটা কই? এই কি গান্ধার-রাজকুমারী অপর্ণবা? অসম্ভব।

রাজকুমারী এসে দাঁড়ালেন ঋজু তাঁর দেহযষ্টি, চলনে তাঁর পরুষ দৃঢ় পাদক্ষেপ, গণ্ডে তাঁর পুরুষ-সুলভ কঠোরতা, দৃষ্টিতে তাঁর অসঙ্কোচ দুর্দ্দমনীয়তা, বাহুতে তাঁর সবল মাংসপেশী—রাজ-কুমারী মালা ধরে' আছেন যেন অসি আকর্ষণ করছেন। এই কি গান্ধার-রাজকুমারী অপর্ণবা? শত নৃপতি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

অবশেষে বিদর্ভরাজ আসন ত্যাগ করে' উঠে দাঁড়ালেন। গান্ধার-রাজকে সম্বোধন করে' বললেন—মহারাজ, এই কুমারী কে?

গম্ভীর কণ্ঠে গান্ধার-রাজ উত্তর করলেন—মহারাজ, এই কুমারী গান্ধার-রাজনন্দিনী অপর্ণবা।

শত নৃপতি আসন ত্যাগ করে' উঠে দাঁড়ালেন। শত নৃপতি একবাক্যে বলে' উঠলেন—গান্ধার-রাজ, এই কুমারীর পাণি-গ্রহণ করতে আমরা অপারগ—আমাদের মার্জ্জনা করবেন আর যুদ্ধার্থেও আমরা অপ্রস্তুত নই।

শত নৃপতি স্বয়ম্বর-সভা ত্যাগ করে' যাঁর যাঁর রাজধানীতে ফিরে' গেলেন।

রাজকুমারী অন্তঃপুরে গিয়ে আপন কক্ষে অর্গল বদ্ধ করে' আকুল হ'য়ে কক্ষতলে লুটিয়ে পড়্‌লেন।

একটা নীরব মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনরোল রাজপুরীর কক্ষে কক্ষে মহলে মহলে ফির্‌তে লাগ্‌ল।

দিবা অবসান হ'ল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এলো।—সারা রাজ-পুরী মৃত্যুর মতো নিঝুম। সেদিন আর ঘরে ঘরে দীপ জ্বল্‌ল না—নহবতে নহবতে রোসনচৌকির সুর ফুট্‌ল না—দেবালয়ে আরতির শঙ্খ-কাঁসর বাজ্‌ল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। রাজকুমারীর কক্ষে বিধাতা পুরুষ আবির্ভূত হলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রাজকুমারী বলে' উঠ্‌লেন—মহান্! নারী জীবনের এ কি অপমান!

বিধাতাপুরুষ উত্তর কর্‌লেন—নারি! পুরুষের জীবনে মুগ্ধ হয়েছিলে—পুরুষের জীবন আকাঙ্ক্ষা করেছিলে—এই তার মূল্য।

রুদ্ধকণ্ঠে রাজকুমারী জিজ্ঞেস কর্‌লেন—প্রভু নারীর কি মুক্তি কোনদিনই নেই—নারী কি কোনদিনই স্বাধীন হবে না?

বিধাতাপুরুষ একটু হাস্‌লেন—তারপর স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ধীরে ধীরে বল্‌লেন—রাজকুমারি, এই ব্রহ্মাণ্ডে স্বাধীন কে? সব নিয়মে বাঁধা—আমি পর্য্যন্ত।

মিলন

মানুষ ছিল একদিন অতি নির্ব্বোধ, তাই সে তার পাশের সঙ্গিনীটিকে রেখেছিল কৃতদাসী করে'। তার পায়ে সে বেঁধে দিয়েছিল লোহার শিকল—এম্‌নি একটু লম্বা যে ঘরের কাজে সে এদিক ওদিক কর্‌তে পারে, কিন্তু বাইরে দৌড়ে ছুটে না পালায়।

সঙ্গিনীটিও থাক্‌ত—ঠিক কৃতদাসীরই মতো।

তার মনের কথা কে জানে? মানুষের কুটীরখানি সে মেজে-ঘসে ধুয়ে-মুছে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করে' রাখ্‌ত। উঠানে নিজহাতে তুলসীগাছ গোড়ায় প্রতি সন্ধ্যায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে সকল অমঙ্গলকে দূরে রাখ্‌বার প্রার্থনা জানাত। মানুষের ক্ষুধার আহার যুগিয়ে দিত, তৃষ্ণার জল এনে দিত, পূজোর ফুল সাজিয়ে দিত। মানুষ মনে মনে ভাব্‌ত—ও যে আমার জন্যে এত করে, তা আমি না হ'লে ওর চলে না বলে'।

মানুষের মনের কথা জেনে বিধাতা মনে মনে হাস্‌লেন। তিনি মজা কর্‌বার জন্যে একদিন সঙ্গিনীটিকে তার পাশ থেকে সরিয়ে নিলেন। মানুষ সেদিন কুটীরে ফিরে এসে দেখ্‌লে যে ক্ষুধার আহার নেই, তৃষ্ণার জল নেই, পূজোর ফুল নেই।

দেখে মানুষ একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি—চেঁচিয়ে ঘর মাথায় করলে কার সঙ্গে কুরুক্ষেত্তর বাধাবে তাই খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময় বিধাতা এসে উপস্থিত হলেন। নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি?

ব্যাপার কি? মানুষ রেগে বলে' উঠ্‌ল—ব্যাপার কি? কোথায় গেল আমার সে? ক্ষুধার আহার নেই, তৃষ্ণার জল নেই, পূজোর ফুল নেই—সেই যে সব কর্‌ত।

বিধাতা বল্‌লেন—কেবল এই?

মানুষ বল্‌লে—তা নয় ত কি!

বিধাতা বল্‌লেন—বেশ তুমি সবই ঠিক্ ঠিক্ পাবে। তোমার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল, সব—কিছুরই ক্রটী হবে না।

বিধাতার মন্ত্রগুণে—মানুষ সব ঠিক্ ঠিক্ পেতে লাগ্‌ল—তার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল—সব ঠিক্ ঠিক্ আগেরই মতো। কিন্তু সঙ্গিনীটি আর ফির্‌ল না।

সেই ঠিক্ ঠিক্ সবই রইল—ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল, কিন্তু সেই সুরটি ত তেমন করে' বাজে না। সেই সুরটি—যে সুরটি তার আহার ও পানের মাঝামাঝি বিচ্ছেদটুকুকে পূর্ণ করে' রাখ্‌ত, তার পান ও পূজোর মাঝামাঝি অবসরটুকুকে সন্তোষ আর তৃপ্তি দিয়ে ভরিয়ে দিত। আজ এ যে আহারের পিছনে কেবল আহারই আছে, জলের পিছনে কেবল জল, ফুলের পিছনে কেবলই ফুল—মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠুরতার মতো, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় হৃদয়হীন যন্ত্রের মতো আপন আপন কর্ত্তব্য করে' চলে।

বাইরের কাজ সেরে মানুষ সেদিন ক্লান্তদেহে তার কুটীরে ফিরে এলো, দেখ্‌লে সব ঠিক্ ঠিক্ সাজানো—তার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল।

মানুষের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠ্‌ল। কে চায়, কে চায় তোমার এ সব? কে চায়, কে চায় তোমার এই হৃদয়হীন বিদ্রূপ? কে চায়, কে চায় তোমার এই যন্ত্র-চালিত নির্দ্দয়তা?

লাথি মেরে সে তার সমস্ত খাবার ছড়িয়ে দিলে—জলের পাত্র উল্‌টিয়ে দিলে—ফুলের রাশি নয়-ছয় করে' দিলে।

বিধাতা এসে উপস্থিত হলেন, বল্‌লেন—আবার ব্যাপার কি?

ব্যাপার কি?—মানুষ ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌লে—ব্যাপার কি? কে চায় তোমার এ সব? নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমার ওই হৃদয়-হীন ভোগ-সামগ্রী। আমার তাকে ফিরিয়ে দাও।

বিধাতা হাস্‌লেন। তার সঙ্গিনীটিকে আবার ফিরিয়ে দিলেন।

মানুষ সেদিন—তার সঙ্গিনীটির পা থেকে লোহার শিকল খুলে নিয়ে তার হাত দুখানিতে সোনার কাঁকন পরিয়ে দিলে, তার গলায় মুক্তাহার দুলিয়ে দিলে, তাকে বক্ষে চেপে চুম্বন করে' বল্‌লে—তুমি ত ক্রীতদাসী নও, তুমি যে পূর্ণা, তুমি অসম্পূর্ণকে পূর্ণ কর, তুমি শূন্যকে সম্পদশালী করে' তোল, তুমি রিক্তকে সুরে ভরিয়ে তোল—তুমি ক্রীতদাসী নও।

সেদিন মানুষ যে ফুল দিয়ে পূজো কর্‌তে বস্‌ল—সে ফুলের গন্ধে দেবতা জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

———

দেশ-সেবক

রাজা চণ্ডসেন। তাঁরই জঘন্য অত্যাচার। সেই অত্যাচারে অত্যাচারে প্রজারা জর্জ্জরিত। অথচ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার একটি লোক নেই।

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায় আর অত্যাচার বেড়েই চলে। পৃথিবীর নর-নারীরা নির্জ্জীব—আকাশের দেবতারা বুঝি সুপ্ত। অত্যাচারের আর প্রতিরোধ হয় না। পৃথিবীর সমস্ত পশুবল রাজার করতলগত।

দেয়ালী রজনীতে রাজার দেয়ালী জলে জনপদবাসীদের গৃহ-দাহে—দোল-লীলায় রাজার হোলিখেলা হয় নাগরিকদের রক্ত-স্রোতে—রাজার মৃগয়ার শীকার তপোবনের ঋষিবালকেরা! অথচ বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আরাম-শয্যায় শয়ান—কৈলাসে মহাদেব নেশায় বিভোর। অথচ আকাশ ভেঙে বজ্র পড়ে না—পৃথিবী-বক্ষ ভূকম্পনে খান্ খান্ হ'য়ে যায় না—লক্ষ লক্ষ উল্কাপাত হয় না—নদ নদী শুকিয়ে যায় না—সাগর মরুভূমি হ'য়ে ওঠে না। দুর্দ্দান্ত রাজা চণ্ডসেন নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করেন। যেন শয়তান তাঁর অনুচর, মহারুদ্র তাঁর রক্ষাকর্ত্তা।

কে দেবে—কে দেবে ওই মূক-মুখে ভাষা? ওই ম্লান-বুকে আশা? ওই লক্ষ লক্ষ নরনারীদের? ওই লক্ষ লক্ষ উৎপীড়িতের? কে জাগিয়ে তুল্‌বে ওই লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্তরের ভগবানকে? কে আজ সহিষ্ণুতা কেড়ে নিয়ে সাহস দেবে? অদৃষ্টকে জয় কর্‌বার শক্তি দেবে? মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুকে পরাজয় কর্‌বার দুর্ব্বার প্রেরণা দেবে? কে আজ বিদ্রোহের পতাকা সগৌরবে তুলে ধর্‌বে?

অবশেষে উঠ্‌লেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সম্বল তাঁর কেবল পরিধান-বস্ত্র আর দেহের উত্তরীয়—আর সম্বল তাঁর মুখের বাণী। যে-বাণীতে বিদ্যুতের স্পর্শ, বজ্রের শক্তি, কাব্যের সম্মোহন, ঋষিদৃষ্টির অভ্রান্ততা।

ব্রাহ্মণের বাণীতে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ-বহ্নি চারিয়ে গেল। যেন একটা অদৃশ্য পাষাণ-স্তূপ দেশের বক্ষ থেকে খসে' পড়্‌ল। ব্রাহ্মণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর্‌লেন—যে-রাজশক্তিতে দেবতার আশীর্ব্বাদ নেই, সে-রাজশক্তি অভিশপ্ত—যে-রাজার অন্তর পিশাচের অভিশাপে সমৃদ্ধ, সে-রাজাকে বধ কর্‌বার অধিকার প্রজাদের আছে।

দেশের বুক থেকে কোটি কণ্ঠে উঠ্‌ল কল-কল করাল নিনাদ। সেই করাল নিনাদে রাজ-প্রাসাদের বিশাল পাষাণস্তূপ কেঁপে উঠ্‌ল।

২

রাজা বিরক্ত হলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করে' জিজ্ঞেস করলেন—মন্ত্রী, কে রাজা চণ্ডসেনের বিশ্রামের ব্যাঘাত করে ?

কোটাল এসে সংবাদ দিলে—মহারাজ, রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত।

রাজা বিস্মিত হলেন—বল্লেন—আমার রাজ্যে বিদ্রোহ ? প্রজারা কি ভুলে গেছে রাজা চণ্ডসেন এখনও সিংহাসনে ? কে তাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি দিলে ?

কোটাল উত্তর করলে—মহারাজ,এক ব্রাহ্মণ—নাম দর্ভকেতু।

রাজা আদেশ করলেন—অবিলম্বে ব্রাহ্মণকে বন্দী করে' রাজ-সমীপে আনা হোক্।

দর্ভকেতু বন্দী হ'য়ে রাজ-সমীপে নীত হলেন। ব্রাহ্মণ সহাস্য আননে রাজ-সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন।

রাজা বল্লেন—ব্রাহ্মণ, রাজদ্রোহ প্রচার করেছ, অপরাধ স্বীকার কর—তোমার মুক্তি হবে।

দর্ভকেতু উত্তর করলেন—মহারাজ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণের কণ্ঠ এতদিন নীরব ছিল সেই আমার অপরাধ—সেই অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

রাজা রুষ্ট হলেন, বল্লেন—ব্রাহ্মণ, তুমি উন্মাদ—অপরাধ স্বীকার কর—রাজা চণ্ডসেন ক্ষমা করতেও জানে।

দর্ভকেতু উত্তর করলেন—মহারাজ, অত্যাচারী রাজা

চণ্ডসেনের ক্ষমা বহন কর্‌বার শক্তি আমার নেই—আমি নিরীহ ব্রাহ্মণ—অশক্ত—অক্ষম।

রাজা চণ্ডসেনের চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌ল—দন্তচাপে অধর কেটে রুধির দেখা দিল। কোটালকে সম্বোধন করে' বল্‌লেন—কোটাল, এই রাজদ্রোহী নির্ব্বোধ দুর্ব্বিনীত ব্রাহ্মণকে অন্ধ কারায় নিক্ষেপ কর। যতদিন পর্য্যন্ত এ অপরাধ স্বীকার না করে, ততদিন আমি নব নব শাস্তির উপায় উদ্ভাবন কর্‌ব।

ব্রাহ্মণ প্রশান্ত মুখে অন্ধ কারায় প্রবেশ কর্‌লেন।

৩

সপ্তাহ অন্তে রাজা কারাকক্ষে প্রবেশ কর্‌লেন। হায় রাজা চণ্ডসেন! দেখ্‌লেন ব্রাহ্মণের সর্ব্ব অঙ্গ যেন সপ্তাহের অন্ধ-কারায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

রাজা বল্‌লেন—ব্রাহ্মণ, অপরাধ স্বীকার কর। নইলে ভীষণ শাস্তি তোমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে।

ব্রাহ্মণ উত্তর কর্‌লেন—মহারাজ, অপরাধ রাজা চণ্ডসেনের—শাস্তি তাঁর প্রাপ্য, প্রজার নয়।

রাজা ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে কোটালকে ব্রাহ্মণের সর্ব্ব অঙ্গ শৃঙ্খলিত কর্‌বার আদেশ কর্‌লেন। দর্ভকেতুর সর্ব্ব অঙ্গ লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ল।

আবার সপ্তাহান্তে রাজা বন্দীর সম্মুখীন হলেন। দেখলেন ব্রাহ্মণের চক্ষুদ্বয় দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, তাঁর মুখমণ্ডলে

অপূর্ব্ব লাবণ্যের ছটা। ক্রুদ্ধকণ্ঠে চণ্ডসেন বল্‌লেন—ব্রাহ্মণ, এখনও অপরাধ স্বীকার কর।

ব্রাহ্মণ সহাস্যে উত্তর করলেন—মহারাজ, ব্রাহ্মণ দর্ভকেতুর সাধ্য কি রাজা চণ্ডসেনের সুবিপুল পশুবলের সম্মুখে দাঁড়ায়। না মহারাজ, আমার মুখের বাণী যে আমার অন্তরের ভগবানের বাণী। আমার সাধ্য কি সে ভগবান্‌কে নশ্বর চণ্ডসেনের সম্মুখে নত করি।

চণ্ডসেনের সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুধিত ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের চিহ্ন দেখা দিল। দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করে' বল্‌লেন—কোটাল, আজ থেকে বন্দীর অনাহার।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্রাহ্মণ অনশনে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন।

৪

তারপর, দিন যায়, সপ্তাহ যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়—একদিন, দ্বিপ্রহর নিশীথে অনশন-ক্লিষ্ট বন্দী অন্ধ-কারার কক্ষতলে লুটিয়ে পড়্‌ল—সর্ব্বাঙ্গের তার লৌহশৃঙ্খল শেষবার একবার স্তব্ধ নিশার বুকে ঝন্ ঝন্ করে' বেজে উঠ্‌ল,—তারপর সব নিস্তব্ধ—ব্রাহ্মণের প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করে' চলে' গেল।

তৎক্ষণাৎ রাজা চণ্ডসেনের কাছে সংবাদ গেল। রাজা কোটালকে ডেকে আদেশ করলেন—কোটাল, কাল প্রত্যুষে ব্রাহ্মণের অবশেষ রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের সম্মুখে ঝুলিয়ে দাও। নাগরিকেরা দেখুক রাজদ্রোহীর কি পরিণাম।

কোটাল প্রণত হ'য়ে বল্‌লে—মহারাজের যে আজ্ঞা। পরদিন প্রত্যুষে সহচর সঙ্গে কোটাল অন্ধ-কারার ক্ষুদ্র দ্বার অর্গল-মুক্ত করে' কারাকক্ষে প্রবেশ কর্‌ল—যেখানে ব্রাহ্মণের মৃতদেহ পড়েছিল সেইখানে দৃষ্টিপাত কর্‌ল—মুহূর্ত্তে কোটালের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল, তার দৃষ্টিতে আর পলক পড়্‌ল না।

রাজার কাছে তৎক্ষণাৎ সংবাদ গেল। রাজা চণ্ডসেন এসে কারাকক্ষে প্রবেশ কর্‌লেন। অন্ধকারের একমাত্র রন্ধ্রপথে একটি কনকরশ্মি এসে কক্ষতলে পড়েছে। সেই রশ্মিতে যেখানে দেশ-সেবকের মৃতদেহ পড়েছিল সেইখানে রাজা চণ্ডসেন দেখ্‌লেন—লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ অস্থিচর্ম্মসার মৃতদেহ নয়—সুবর্ণ-শৃঙ্খলের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে এক রাশ তাজা পুষ্পমাল্য।

রাজা তৎক্ষণাৎ কারাকক্ষ থেকে বেগে নির্গত হলেন। তাঁর অন্তরে একটা দারুণ বিভীষিকা স্পর্শ করে' গেল—চোখে একটা ভীতিসঙ্কুল দৃষ্টি ফুটে উঠ্‌ল।

কোটাল জিজ্ঞেস কর্‌ল—মহারাজ, এই মাল্য কি সিংহ-দ্বারের সাম্‌নে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে?

রাজা চণ্ডসেনের কাছ থেকে কোন উত্তর এলো না। তিনি ত্রস্তপদে রাজপ্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হলেন। যেন কোন্ মহা-কালের অদৃশ্য-শক্তি তাঁর পশ্চাদ্ধাবন কর্‌ছে।

দৈত্য-রাজ

নিস্তব্ধ পাতালপুরীতে দৈত্যরাজ ধ্যানে বসে'—কোথায় তার ইষ্টদেবতা—ধ্যানস্তিমিত চোখের সাম্‌নে ফুটে ওঠে অমরাবতীর অপরূপ ছবি! দেবতাদের অপূর্ব্ব জ্যোতি পুলকিত মূর্ত্তি—হাতে হাতে তাদের অমৃত পরিপূর্ণ পাত্র—অপ্সরীদের লাস্য-বিজড়িত আঁখি—তালে তালে তাদের চরণ নূপুরের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস, ছন্দে ছন্দে দেহ-লতিকার মন্মথ-মনোহারিণী গতিভঙ্গী। যেন পারিজাত ঘ্রাণ তার নাকে এসে লাগে, অপূর্ব্ব সুর লহরী তার কানে এসে বাজে। দৈত্যরাজের ধ্যান ভেঙ্গে যায়—দৈত্যরাজ আসন ছেড়ে উঠে পড়ে।

এম্‌নি করেই দিন যায়—ধীরে ধীরে দৈত্যরাজের কাছে দৈত্য-জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠ্‌ল। দৈত্য ভাবে, আমি দৈত্যরাজ, অথচ অপূর্ব্ব সম্ভোগ আমার আয়ত্তে নয়—কোন্ মন্ত্রে দেবতারা এমন দিব্য ভোগের অধিকারী? দৈত্যরাজের মনে ঐ প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যায়—ওর উত্তর আর কিছু উদয় হয় না।

এম্‌নি করেই দিন কাটে। দৈত্যরাজের মনে সোয়াস্তি নেই, অথচ অসোয়াস্তি তাড়াবার উপায়ও জানা নেই।

২

বিশ্ব-বিধাতার মনে কি আছে কে জানে? একদিন ধ্যানরত দৈত্যরাজের সাম্‌নে আবির্ভাব হ'ল তার ইষ্টদেবতার। ইষ্টদেবতা বল্‌লেন—"দৈত্যরাজ, আমি তোমার ধ্যানে তুষ্ট হয়েছি। বর প্রার্থনা কর।"

দৈত্যরাজ মহোল্লাসে উল্লসিত হ'য়ে উঠল, প্রণিপাত করে' বল্‌লে—"ইষ্টদেব, যদি তুষ্ট হ'য়ে থাকেন তবে এই বর প্রদান করুন যেন আমার শরীরে অমিত বলসঞ্চার হয়, যেন দেব যক্ষ রক্ষ নর কিন্নর গন্ধর্ব্ব কেউ আমার গতির প্রতিরোধ কর্‌তে না পারে।"

ইষ্টদেব মনে মনে হাস্‌লেন—বল্‌লেন—"তথাস্তু"। তারপর ইষ্টদেব অন্তর্ধ্যান হলেন। দৈত্যরাজের ধ্যান ভেঙ্গে গেল।

দৈত্যরাজ ভাব্‌লে—এইবার স্বর্গ আমার করায়ত্ত।

তারপর দৈত্যরাজের আদেশে পাতাল পুরীতে বিরাট দৈত্য-বাহিনী যুদ্ধসাজে সজ্জিত হ'ল। রথী সারথী মহারথী—হয় হস্তী স্যন্দন—ধনুক শায়ক শূল কৃপাণ চর্ম্ম খড়্গ বর্ম্ম তূরী ভেরী শঙ্খ দামামা নাকাড়া যুদ্ধোপকরণ সব এক সঙ্গে জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌ল।

দৈত্যরাজ ঘোষণা কর্‌লে—অভিযান দেবতাদের বিরুদ্ধে।

বিশাল দৈত্যচমূ থেকে বিরাট হুঙ্কারে জয়োল্লাস উত্থিত হ'ল—"জয় দৈত্যরাজের জয়।"

৩

সেদিন অমরাবতীতে পারিজাত-উৎসব।

নিশীথে সেদিন দেবসভা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছে। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র দেবসভাকে প্রদক্ষিণ করে' করে' তাদের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে সভা উজ্জ্বল করে' রাখ্‌ছে। পারিজাত-কোরকে সভাতল সমাচ্ছন্ন, পারিজাত-সৌরভে দিক আমোদিত, পারিজাত-গৌরবে দেশ পুলকিত। দেবতাদের গলে পারিজাতের মালা, কানে পারিজাতের কুণ্ডল, মাথায় পারিজাতের মুকুট, তাদের পানপাত্রে পারিজাত-হৃদয়-পুষ্ট-সুরা।

সভাতলে নৃত্যগীতরতা অপ্সরীরা। তাদের কুন্তলে পারিজাত-হার, স্তনমণ্ডল ঘিরে পারিজাত-মাল্য, কটি বেষ্টন করে' পারিজাত-কিঙ্কিণি, শ্রোণীভারে পারিজাত-মেখলা, প্রকোষ্ঠে পারিজাত-কঙ্কণ। তাদের গানে পারিজাতের সুর, নৃত্যে পারিজাতের ছন্দ, হাস্যে পারিজাতের মোহ, কটাক্ষে পারিজাতের লাস্য।

সেদিন অমরাবতীতে পারিজাত-উৎসব।

সহসা দৈত্যচমূর বিকট হুঙ্কারে খ-লোক দীর্ণ বিদীর্ণ হ'ল।

দেবতারা চকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন—অপ্সরীদের হৃদয় কেঁপে উঠ্‌ল—কণ্ঠে তাদের গান থেমে গেল—চরণে তাদের নৃত্য-ছন্দ থাম্‌ল—দেহে তাদের গতি-ভঙ্গিমা থাম্‌ল—শৃঙ্খলা ও আনন্দের মাঝে জেগে উঠ্‌ল বিশৃঙ্খলা ও ত্রাস।

আবার বিকট হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গদ্বার সশব্দে ভেঙ্গে পড়্‌ল।

তারপর দেবতা দৈত্যে তুমুল সংগ্রাম, প্রহরের যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হ'য়ে পাতালে নিক্ষিপ্ত হলেন। দৈত্যকটক বিরাট হুঙ্কারে জয়োল্লাস করে' উঠ্‌ল—"জয় দৈত্যরাজের জয়।"

৪

দৈত্যরাজ দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনে আসন গ্রহণ করে' বল্‌লে—পারিজাত-উৎসব যেমন চল্‌ছিল তেম্‌নি চলুক।

নক্ষত্রেরা আবার সভা প্রদক্ষিণ করে' ঘুর্‌তে লাগ্‌ল—পারিজাতের সৌরভে গৌরবে আবার দিক ভরে' গেল—অপ্সরীদের নৃত্যে গীতে হাবে ভাবে হাস্যে লাস্যে ভ্রূভঙ্গে কটাক্ষে পারিজাত-উৎসবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হ'ল।

দৈত্যরাজের হাতে অমৃতের ভাণ্ড।

কিন্তু কই তেমন ত লাগ্‌ছে না! এই ত অমরাবতী, এই ত দেবসভা, ওই ত উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা, এই ত সুবাহু সুকেশী রুচিরা বিদ্যুৎপর্ণা, ওই ত হেমা সোমা সুমধ্যা সুরথী—এই ত গলে পারিজাত-মালা, হাতে অমৃত পরিপূর্ণ ভাণ্ড—কিন্তু কই তেমন ত লাগ্‌ছে না? চোখে সে নেশা কই? অন্তরে সে উল্লাস কই? বাতাসে সে পুলক কই? সঙ্গীতে সে উন্মাদনা কই? শিঞ্জিনিতানে সে শব্দ-তরঙ্গ কই? তার ধ্যান-নেত্রের সাম্‌নে যে স্বর্গের ছবি ফুটে উঠেছিল, যে শান্তি ও আনন্দ, যে ভোগ ও তৃপ্তি, যে সুন্দর ও মঙ্গল—কোথায় সে? কোথায় সে? সব কি কেবল বঞ্চনা?

একটা গভীর বেদনা ও দারুণ নৈরাশ্য দৈত্যরাজকে অভিভূত কর্‌ল। দৈত্যরাজ উপায়হীন বদ্ধ সিংহের মতো গর্জ্জন করে' উঠ্‌ল—বল্‌লে—"থামাও—থামাও—ঐ নৃত্য গীত উৎসব।"

পলকে সব থেমে গেল। নক্ষত্রেরা সরে' গেল—অপ্সরীরা নিষ্ক্রান্ত হ'ল—পারিজাত আপন সৌরভ গোপন কর্‌ল। দেব-সভায় গভীর স্তব্ধতা ও অমানিশার আঁধার নেমে এল। দেব-রাজের সিংহাসনে দৈত্যরাজ ঘোর দুঃখে অভিভূত হ'য়ে তন্দ্রার কোলে ঢলে' পড়্‌ল।

দৈত্যরাজের তন্দ্রামগ্ন চোখের সাম্‌নে আবির্ভূত হ'ল তার ইষ্টদেবতা।

দৈত্যরাজ ব্যাকুল-কণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল—"ইষ্টদেব, স্বর্গজয় কর্‌লুম তবু এ কি বেদনা!"

ইষ্টদেব একটু হাস্‌লেন—বল্‌লেন—"দৈত্যরাজ, দেবতাদের তাড়িয়েছ কিন্তু স্বর্গজয় তুমি কর নি।"

—"সে কি প্রভু?"

—"বাহুবলে তুমি উপকরণকেই সংগ্রহ করেছ, আত্মবলে তুমি সামর্থ্যকে অর্জ্জন কর নি—তাই স্বর্গে বসেও তুমি স্বর্গভোগের অনধিকারী।"

কৃতাঞ্জলিপুটে দৈত্যরাজ জিজ্ঞেস কর্‌ল—"উপায় কি প্রভু?"

ইষ্টদেব উত্তর দিলেন—"তপস্যা—আত্মার সাধনা।"

৫

দৈত্যরাজ পাতালে গিয়ে তপস্যায় বস্‌ল—এক আসনে আশী হাজার বছর তপস্যা কর্‌ল। তারপর একদিন মুলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হ'ল—সেই দিব্যশক্তি সুষুম্না পথে ষট্‌চক্র ভেদ করে' সহস্রার জ্যোতি শতদল বিকশিত করে' দিল। দৈত্যরাজের দেহ মন এক অপূর্ব্ব পুলকে পরিপ্লুত হ'য়ে গেল। চক্ষু মেলে দেখ্‌লে দিক দেশ এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভরে' গেছে। তার দেহ এক অপূর্ব্ব জ্যোতি-সাগরে ভাস্‌ছে।

ইষ্টদেব এসে বল্‌লেন—"বৎস, স্বর্গজয়ের তোমার আমন্ত্রণ এসেছে।"

দৈত্যরাজ বল্‌লে—"প্রভু, স্বর্গে আর আমার প্রয়োজন নেই।"

ইষ্টদেব বল্‌লেন—"কিন্তু এখানে ত তোমার আর থাক্‌বার অধিকার নেই।"

দৈত্যরাজ বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"অধিকার ?"

ইষ্টদেব বল্‌লেন—"তুমি পাতালের নিয়মকে অতিক্রম করেছ—এখন তোমার সান্নিধ্য তোমার স্পর্শ এখানে কেবল বিশৃঙ্খলা ও বেদনাই জাগিয়ে তুল্‌বে।"

দৈত্যরাজ হতাশ-কণ্ঠে বল্‌লে—"আমি যে আমার সৈন্য-সামন্ত সব হারিয়েছি প্রভু !"

ইষ্টদেব বল্‌লেন—"আর সৈন্য-সামন্ত নয় এবার স্বর্গজয়ে যেতে হবে একাকী।"

দৈত্যরাজের চোখে সংশয়ের দৃষ্টি জেগে উঠ্‌ল।

ইষ্টদেব পুনরায় বল্‌লেন—"একাকী ও নিরস্ত্র।"

৬

দৈত্যরাজ পাতাল ত্যাগ করে' যাত্রা কর্‌ল।

সেদিন স্বর্গে পারিজাত-উৎসব।

নিশীথে দেবসভা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছে। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র দেবসভাকে প্রদক্ষিণ করে' করে' তাদের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে সভা উজ্জ্বল করে' রাখ্‌ছে। পারিজাত-কোরকে সভাতল সমাচ্ছন্ন পারিজাত-সৌরভে দিক আমোদিত, পারিজাত-গৌরবে দেশ পুলকিত। দেবতাদের গলে পারিজাতের মালা, কানে পারিজাতের কুণ্ডল, মাথায় পারিজাতের মুকুট—তাদের পানপাত্রে পারিজাত-হৃদয়-পুষ্ট-সুরা।

সভাতলে নৃত্যগীতরতা অপ্সরীরা—তাদের কুন্তলে পারিজাত-হার, স্তনমণ্ডল ঘিরে পারিজাত-মাল্য, কটিবেষ্টন করে' পারিজাত-কিঙ্কিণি, শ্রোণীভারে পারিজাত-মেখলা, প্রকোষ্ঠে পারিজাত-কঙ্কণ। তাদের গানে পারিজাতের সুর, নৃত্যে পারিজাতের ছন্দ, হাস্যে পারিজাতের মোহ, কটাক্ষে পারিজাতের লাস্য।

দৈত্যরাজ ধ্রুবলোক সত্যলোক জনলোক তপলোক গন্ধর্ব্ব-লোক অতিক্রম করে' স্বর্গলোকে এসে পৌঁছ্‌ল।

দেখলে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত।

উৎসব উল্লসিত দেবসভায় গিয়ে দৈত্যরাজ দেখে দেবতাদের সিংহাসনের পাশে তার জন্য সিংহাসন পাতা।

সিংহাসনের পাশে পারিজাত-মালা-হাতে দণ্ডায়মানা উর্ব্বশী।

মৃত-সঞ্জীবনী

অশীতিপর বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল, তাঁর বাঁকা দেহযষ্টি ক্ষণকালের জন্যে সোজা হ'য়ে উঠ্‌ল, কম্পান্বিত হাতে চশমা জোড়াটা ভাল করে' চোখে বসিয়ে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ কর্‌লেন—না ভ্রান্তি নয়—দৃষ্টির বিভ্রম নয়—ঐ যে স্পষ্ট বকযন্ত্রের মুখ থেকে চুঁইয়ে কাঁচের গেলাসে আর এক ফোঁটা রস পড়্‌ল, স্বর্ণাভ আরও এক ফোঁটা তরল পদার্থ। বৃদ্ধের জীবনব্যাপী সাধনার আজ সিদ্ধি। মৃত-সঞ্জীবনী আজ তাঁর করতলগত।

চল্লিশ বছরের আগের কথা। তখন সারা বাংলা দেশে এমন কেউ ছিল না যে কলিকাতা মহানগরীর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ভুবন দত্তর নাম না জান্‌ত। অদ্ভুত তাঁর চিকিৎসা-প্রণালী। যেন কৃতান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ সমরেও তিনি জয়লাভ কর্‌তেন। সর্ব্বসাধারণে তাঁকে ধন্বন্তরী বলেই জান্‌ত।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে ভুবন দত্ত চিকিৎসা ব্যবসায় থেকে অবসর নিয়েছেন। সারা বাংলা দেশ জুড়ে হাহাকার উঠ্‌ল। ভুবন দত্তর বন্ধু-বান্ধবেরা দেশের ও দশের কল্যাণের

জন্য এ থেকে তাঁকে বিরত হ'তে কত অনুরোধ-উপরোধ কর্‌লেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। ভুবন দত্তর প্রকাণ্ড ঔষধালয়ের দুয়ার বন্ধ হ'ল—তাঁর প্রকাণ্ড বসতবাটীর দরজা-জানালা রুদ্ধ হ'য়ে গেল। ভুবন দত্ত বাইরের জগত থেকে যেন জন্মের মতো বিদায় নিলেন। সেই থেকে বাইরের কোন লোক আর তাঁকে চোখে দেখে নি। কেবল প্রথম প্রথম তাঁর সম্বন্ধে চারিদিকে নানা জল্পনা-কল্পনা চল্‌ত। কিন্তু সেই রুদ্ধ-জানালা বন্ধ-দুয়ার বাড়ীর ভিতরকার মানুষটীর আসল রহস্য জান্‌বার কারোই সুযোগ হয় নি। বছরের পর বছর চলে' গেল। ক্রমে ক্রমে বাইরের জগতের কাছে ভুবন দত্তর নাম উপকথারই সামিল হ'য়ে উঠ্‌ল।

তারপর চল্লিশটি বছর কেটে গেল। একদিন রাত্রে এক প্রহরের সময় রসায়নাগারে অশীতিপর বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল, তাঁর বাঁকা দেহযষ্টি ক্ষণকালের জন্য সোজা হয়ে উঠ্‌ল, কম্পান্বিত হাতে চশমা জোড়াটা ভাল করে' চোখে বসিয়ে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ কর্‌লেন—না ভ্রান্তি না—দৃষ্টির বিভ্রম নয়—ঐ যে স্পষ্ট বকযন্ত্রের মুখ থেকে চুঁইয়ে কাচের গেলাসে আর এক ফোঁটা রস পড়্‌ল—স্বর্ণাভ আরও এক ফোঁটা তরল পদার্থ। ঐ তরল পদার্থ হচ্ছে মৃত-সঞ্জীবনী। যার স্বপ্ন যুগ যুগ মানুষ দেখেছে। ভুবন দত্তর রসায়নাগারে সেই স্বপ্ন আজ শরীরী হ'য়ে দেখা দিল।

কাঁচের গেলাস ধীরে ধীরে মৃত-সঞ্জীবনীতে পূর্ণ হ'ল। মহা-

নগরীর কোলাহল ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হ'য়ে এসেছে, ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। দূরে দুএকটা গলিতে তখনও কুল্‌পীওয়ালা কুল্‌পী হেঁকে বেড়াচ্ছে। কোন্ একটা গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে' বারটা বেজে গেল। সেই ঘড়ির আওয়াজ স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে নিস্তব্ধ মহানগরীর বুকে কি যেন একটা অস্পষ্ট নিবিড় বেদনার আভাস জাগিয়ে দিলে। কোথায় যেন কি-একটা জীবন-মরণের ট্রাজিক্ খেলা চলেছে।

মৃতসঞ্জীবনীপূর্ণ গেলাস নিয়ে বৃদ্ধ রসায়নাগার থেকে তাঁর বস্‌বার ঘরে এলেন। বস্‌বার ঘরের সমস্ত বিজলী বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। ঘরখানি আধা আধুনিক ইউরোপীয় আধা প্রাচীন গ্রীক ধরণে সজ্জিত। দেয়ালে আধুনিক বাঙালী চিত্রকরের আঁকা কয়েকখানি বিখ্যাত ছবি, ঘরের চার কোণে চারটি প্রকাণ্ড প্রাচীন গ্রীকধরণের ফুলদানি। সব ধুলিসমাচ্ছন্ন, বিঁজলি বাতির গায়ে গায়ে মাকড়সারা "হ্যামক্" টাঙ্গিয়ে দিব্বি সব আরাম কর্‌ছে। কতকাল এ ঘর ব্যবহার করা হয় নি—যেন কোনদিন খোলাও হয় নি। ভুবন দত্ত শ্বেতপাথরের একটা ছোট্ট গোল টেবিলের উপর মৃতসঞ্জীবনীর গেলাসটি রাখ্‌লেন।

বিজলীবাতির রশ্মি পড়ে সেই মৃতসঞ্জীবনী গলিত-স্বর্ণের মতো দেখা যেতে লাগ্‌ল। বৃদ্ধের নির্নিমেষ দৃষ্টি সেই গেলাসের উপর নিবদ্ধ। আর তার মনে হাজার চিন্তার জাল রঙীন হ'য়ে উঠছে।

ফিরে পাবে—আবার সে ফিরে পাবে। সমস্ত জীবন সে ব্যর্থ করেছে এই সাধনায়। জীবনের উচ্ছ্বসিত রঙীন ফেনিল সুরা মরকতের পেয়ালায় তার ঠোঁটের সাম্‌নে ধরা হয়েছিল কিন্তু সে তা গ্রহণ করে নি। সমস্ত যৌবন সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে—সমস্ত যৌবনকে ব্যর্থ করেছে। কোন্ মরীচিকার আশায়? মরীচিকা? না, সিদ্ধি যে আজ তার করতলগত।

না—কিছুই ব্যর্থ হয় নি—কিছুই ব্যর্থ হবে না। আবার এই জরাজীর্ণ শরীরে জীবনের প্রকাশ হবে—নিস্তেজ ধমনীতে ধমনীতে শোণিতের বেগ খরতর হবে—চোখের দৃষ্টি রঙীন হবে—পৃথিবী সুন্দরী হবে—চিরকালের জন্যে সে সৌন্দর্য্য আর মিলিয়ে যাবে না, সে রক্তের বেগ আর মন্দীভূত হবে না, সে রঙীন দৃষ্টি আর সুরহীন হবে না। মানুষ আজ অমর। ভুবন দত্ত তার সাধক। সে সাধনার সিদ্ধি আজ তার সম্মুখে।

বৃদ্ধ ভুবন দত্ত কম্পান্বিত হাতে ধীরে ধীরে মৃতসঞ্জীবনীপূর্ণ গেলাসটি তাঁর ঠোঁটে তুলে' ধর্‌লেন।

তরল পদার্থ তাঁর ওষ্ঠ স্পর্শ করে-করে, এমন সময় তাঁর কানে এসে বাজ্‌ল দুটি কথা—"সম্বর, সম্বর।"

চম্‌কে উঠে ভুবন দত্ত গেলাস তাঁর ঠোঁট থেকে নামালেন। তারপর ফিরে চেয়ে দেখ্‌লেন। বিস্ময়ে তাঁর দু চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে গেল। কক্ষের মধ্যস্থলে একটা ছোট্ট টেবিলের উপর একটা গ্রীক "হার্প" দাঁড় করান। ভুবন দত্ত দেখ্‌লেন সেই হার্পের ফ্রেমের উপর একখানি হাত রেখে দণ্ডায়মানা এক অপরূপ

সুন্দরী যুবতী। যুবতীর রূপের প্রভায় সমস্ত কক্ষ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

অপরূপ এক সুন্দরী রূপসী। ভুবন দত্তর হাতের গেলাসের তরল পদার্থের যেমন গলিত স্বর্ণের রঙ্ তেমনি রমণীর গায়ের রঙ্—তার মাথায় একরাশ স্বর্ণাভ চুল—চোখে দেখেই বোঝা যায় তা যেমন নরম তেম্নি মোলায়েম—আলো প্রতিফলিত হ'য়ে চুলের রাশ রেশমের মতো চিক্ চিক্ কর্‌ছে—রমণীর চোখের তারা যেন কালোর সঙ্গে সোনালি রঙ্ মিশিয়ে, সেই চোখের তারায় কি যেন একটা অনির্ব্বচনীয়—ধরা যায়-যায় যায়-না—যেন যুগপৎ একটা প্রবল আকর্ষণ আর একটা ভীষণ বিভীষিকার সুকৌশল মিশ্রণ—যা আকর্ষণ করে আবার ভয় জাগায়—যা ত্রাসিত করে আবার কাছে টানে—যে-দুটোকে আলাদা আলাদা করে' গ্রহণ কর্‌বার উপায় নেই। যুবতীর বক্ষের উপর স্বর্ণসূত্রের নির্ম্মিত আঁচলি—পরিধানে স্বর্ণসূত্রে বোনা বস্ত্র।

ভুবন দত্তর যখন বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল তখন সবার প্রথমেই তাঁর কণ্ঠ থেকে বিস্ময়ের প্রশ্নটা বের হ'ল—"এই রুদ্ধ-জানালা বন্ধ-দুয়ার গৃহে প্রবেশ কর্‌লে কি করে'?"

যুবতী হেসে উঠ্‌ল। ভুবন দত্ত ঠিক ঠাহর কর্‌তে পার্‌ল না যে রমণী বাস্তবিকই হেসে উঠ্‌ল, না হার্পের তারগুলোতে একবার সে আঙুল চালিয়ে নিলে। তারপর বল্‌লে—"বেহুলার বাসর-ঘর মনে আছে—সেই বাসর-ঘরেও আমি প্রবেশ করেছিলুম।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"তুমি কে?"

—"আমি মৃত্যু।"

এবার ভুবন দত্ত হেসে উঠ্‌লেন—বল্‌লেন—"সুন্দরি, মৃত্যু কি এমন সুন্দর হয়, এক কবিতায় ছাড়া? কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে মৃত্যুর ধারণা জান ত? আমাদের মৃত্যু হচ্ছে, যমরাজা যিনি চড়ে' বেড়ান কালো মহিষের উপর, আর পাশ্চাত্যের মৃত্যুর ধারণা কেবল এক কঙ্কাল, হাতে যার ধান-কাটা কাস্তে।"

সুন্দরী বল্‌লে—"কিন্তু ও-দুটোই ভুল। তোমরা দু'জনেই মৃত্যুর ধারণা করেছ ভয় থেকে, তাই ঐ ভ্রান্তি। কবিই সত্য। তাই তার মৃত্যু সুন্দর। বৃদ্ধ, আমি সুন্দর—আমি প্রাচীনকে নবীন করি, কদর্য্যকে বিলুপ্ত করি, অক্ষমকে সামর্থ্যবান্ করি—আমারি স্পর্শে অস্তাচলগামী সূর্য্য আবার উদয়াচলে কনকরশ্মি ফেলে নবজীবনের তরুণ রাগ বাজায়। আমারি মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণশক্তি সংহত। সেই প্রাণশক্তির স্পর্শে এক দিকে ধ্বংস আর একদিকে সৃষ্টি। বৃদ্ধ, মৃত্যু কদর্য্য নয়, সে সুন্দর।"

ভুবন দত্ত কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"সুন্দরি! কেবল প্রাণশক্তি কি সৃষ্টি কর্‌তে পারে?"

মৃত্যু হেসে বল্‌লে—"বৃদ্ধ, দেখছি সারাজীবন রসায়নাগারে কাটালেও দর্শন সম্বন্ধেও তোমার কৌতূহল আছে। তবে শোন —কেবল প্রাণশক্তির সাধ্য কি সৃষ্টি করে—না, এই প্রাণশক্তির পিছনে আছে জ্ঞানশক্তি, আর এই জ্ঞানশক্তির পিছনে আছে

ইচ্ছাশক্তি। এই তিন শক্তির মিলনই সৃষ্টিকে সম্ভব করে' তোলে। এই তিন শক্তির যে কোন একটার সৃষ্টি করার হিসেবে কোন মূল্য নেই।"

ভুবন দত্ত বল্‌লেন—"সুন্দরি! বেশ মেনেই নিচ্ছি তুমি মৃত্যু। কিন্তু এখানে তোমার আস্‌বার হেতু কি?"

—"তুমি আমাকে ডেকেছ বলে'।"

—"আমি তোমায় ডেকেছি?"

—"ডেকেছ বই কি!"

—"কখন?—কেমন করে'?"

—"গত চল্লিশ বছর ধরে'—সোনালি রঙের তোমার চিঠি—সে চিঠি আজ আমার হাতে পৌঁছেচে"—সুন্দরী দেখিয়ে দিলে কাঁচের গেলাসে রক্ষিত স্বর্ণবর্ণ মৃতসঞ্জীবনী—বল্‌লে—"ঐ তোমার ডাকা।"

বৃদ্ধ বল্‌লেন—"ও ত মৃত্যু নয়—ও যে মৃতসঞ্জীবনী।"

মৃত্যু বল্‌লে—"বৃদ্ধ, ভুলে গেলে কি যে আমিই জীবন। এক একটি নিমেষ আলাদা করে' দেখ্‌লে আমি মৃত্যু আবার দুইটি নিমেষ এক সঙ্গে করে' দেখলেই আমি জীবন। এই ত আমার রহস্য। তাই মানুষ একদিকে যেমন আমায় ভয় করেই চলেছে, অন্যদিকে আবার তেম্‌নি আমার জন্যে তার আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই। তাই ত আমার আধিপত্য আজও ক্ষুণ্ণ হ'ল না।"

রসায়নবিদ্‌, মৃতসঞ্জীবনীপূর্ণ কাচের গেলাসটি তাঁর চোখের সাম্‌নে তুলে' ধর্‌লেন। বিজলীবাতির লক্ষ লক্ষ রশ্মিস্পর্শে মৃত-

সঞ্জীবনী কাঁচা সোনার মতো জল্ জল্ করে' উঠল। বৃদ্ধ বল্লেন —"কিন্তু মৃত্যু, এইবার তোমার আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবে। এই মৃত-সঞ্জীবনীর প্রসাদে কেবল জীবনই সত্য হ'য়ে থাকবে—মৃত্যুকে বাদ দিয়ে।"

মৃত্যু বল্লে—"তাই ত, আমি ছুটে এসেছি।"

—"কেন?"

—"বিশ্বমানবকে ঐ মৃত-সঞ্জীবনীর অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে।"

—"অভিশাপ!"

—"বৃদ্ধ, অনন্তকালের ধারণা কর্তে পার?"

—"অনন্ত কাল?"

—"হাঁ অনন্তকাল। হাজার বছর, লক্ষ বছর, কোটী বছর নয়—অনন্ত—অনন্ত—অনন্তকাল।"

ক্ষণকাল চিন্তা করে' ভুবন দত্ত উত্তর কর্লেন—"সুন্দরি! সত্য কথা বল্তে কি মনের ধারণাশক্তি অতদূর পৌঁছয় না। যতদূর পর্য্যন্ত ধারণা করা যাক্ না কেন—তবুও যে অনন্ত শেষ হয় না। অনন্তের অনন্ত অংশ তবুও যে তার বাইরেই থেকে যায়।"

মৃত্যু বল্লে—"অথচ এই অনন্তকাল ধরে' একটা মানুষের একটানা জীবন—লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বছরের স্মৃতি নিয়ে—মানুষের জীবনে আর বাল্য আস্বে না, কৈশোর আস্বে না, যৌবন আস্বে না—কেবল একটা অপরিবর্ত্তনীয় একটানা সুর—যার বিরতির কোন আশা নেই সম্ভাবনা নেই—যা থেকে মুক্তির

আর কোন সম্ভাবনাই থাক্‌বে না—বল্‌তে পার, মানুষের পক্ষে এ বর হবে না অভিশাপ হবে? মৃত্যুর পূর্ণচ্ছেদ যাকে আকাঙ্ক্ষার করে' তুলেছে সমাপ্তিহীনতার দারুণ বোঝা যে তাকে অসহ্য করে' তুল্‌বে। বৃদ্ধ, মৃত্যু অনিবার্য্য বলে' এখন ধারণা কর্‌তে পার না যে, মৃত্যু মানুষের কতবড় মুক্তি—মৃত্যু মানুষের কতবড় বন্ধু।"

বৃদ্ধ উত্তর কর্‌লেন—"সুন্দরি! আমার প্রতি অবিচার কোরো না। মৃত্যু মানুষের পরম বন্ধু আমি জানি। কিন্তু কেন? কারণ জরা আছে বলে'। মানুষকে যদি অনন্ত যৌবনের অধিকারী করে' তোলা যায় তবে মৃত্যু-মুক্তির সার্থকতা কোথায় থাক্‌বে?"

একটা বিরাট দীর্ঘনিশ্বাসে সুন্দরীর বক্ষ উন্নত হ'য়ে উঠ্‌ল—সেই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে' মৃত্যু বল্‌লে—"হায়! মানুষ কি কল্পনার জগতই না সৃষ্টি করে। চিকিৎসক, জান কি অনন্ত যৌবনের অর্থ? ওর অর্থ মানুষের অনন্ত সুখ অনন্ত দুঃখ। কিন্তু এই অনন্ত সুখ অনন্ত দুঃখ ভোগের জন্য মানুষের অনন্ত ভোগ-সামর্থ্য কোথায়? মানুষের চোখের তারায় যখন এ পৃথিবীর কোন বস্তু কোন দৃশ্যই নতুনের রহস্য নিয়ে প্রতিফলিত হবে না, যখন তার হৃদয়-বীণায় কোন সুরই আর প্রথম প্রণয়-স্পর্শের মতো ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌বে না, যখন তার অন্তরের সহস্র আশা আকাঙ্ক্ষার মদিরা নিঃশেষে পীত হ'য়ে যাবে, তখন যে মানুষের অনন্ত যৌবন একটা অনন্ত মরুভূমির মত হ'য়ে উঠবে।"

চিকিৎসক উত্তর কর্‌লেন—"মৃত্যু! একথা কেন মনে কর্‌ছ যে মানুষ চিরকাল তার সুখ দুঃখের জন্যে অক্লান্তভাবে তার বাইরের বস্তু-বিশ্বের উপরই নির্ভর করে' থাক্‌বে? এটা কি জান না যে মানুষের মধ্যে সেই এক বস্তু আছে যা মানুষকে স্বয়ংসিদ্ধ করে' রাখ্‌তে পারে। মানুষের মধ্যেকার অমৃত যে-দিন তার লাভ হবে সেদিন ত মর্ত্ত্যের নিয়ম আর তাকে বাঁধ্‌তে পার্‌বে না।"

মৃত্যু জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কিন্তু সে অমৃত কি মানুষের লাভ হয়েছে?"

বৃদ্ধ উত্তর কর্‌লেন—"হয় নি, কিন্তু একদিন হবে।"

মৃত্যু একটু হেসে বল্‌লে—"বৃদ্ধ, জান না কি যে মানুষের যেদিন সেই অমৃত লব্ধ হবে সেদিন মৃত-সঞ্জীবনীর কোন মূল্যই আর তার কাছে থাক্‌বে না। তখন তার কাছে মৃত্যুর এপার আর মৃত্যুর ওপার আলাদা থাক্‌বে না। মৃত্যুর এপারে আলো ওপারে আঁধার এ-ত তখন সে মান্‌তে পার্‌বে না। জন্মের সন ও মৃত্যুর তারিখই ত তখন তার ভ্রান্তি ঘটাবে না। তখন যে সে জান্‌বে তার সেই অমৃতময় সত্ত্বা জন্মের সময়েই সৃষ্টি হয় নি এবং মৃত্যুর সঙ্গেই ধ্বংস হবে না। তখন এই জড় শরীরের প্রতি কোন্ লালসা তার থাক্‌বে? মৃত-সঞ্জীবনী তখন যে তার কাছে হাসির কথা হ'য়ে উঠ্‌বে। মর্ত্ত্যের সুখ-দুঃখকে যখন মানুষ ছাড়িয়ে উঠ্‌বে তখন এই মর্ত্ত্য-শরীরকে চিরন্তনের করে' রাখ্‌বার জন্যে মানুষের কোন্ লোভ হবে? ভুবন দত্ত, দেখ্‌ছ মানুষের আত্মার

ঐ অবস্থা আর তার শরীরের অবিনশ্বরতার মধ্যে পরস্পর কোন সঙ্গতি নেই। মর্ত্ত্য-মনেরই মর্ত্ত্য-শরীরকে অমর করে' রাখ্‌বার লোভ—অমৃতের পুত্রের ইহ ও অমূত্রের মধ্যে কোন্ ব্যবধান ?"

ভুবন দত্ত কিছুক্ষণ চুপ করে' রইলেন। তারপর তাঁর মৌনতা ভঙ্গ করে' ধীরে ধীরে বল্‌লেন—"সুন্দরি! এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কেবল দার্শনিক তর্কজালই বিস্তার করেছি। কিন্তু মানুষের কর্ম্মসূত্র দর্শনের ন্যায়সূত্রের দ্বারাই গ্রথিত নয়। বল্‌ছ—মৃত-সঞ্জীবনী মানুষের একটা অভিশাপ হবে। হোক্ অভিশাপ—মানুষকে এমন কাপুরুষ কেন ভাব্‌ছ যে ওই অভিশাপের ভয়ে সে মৃত্যুর শক্তির সঙ্গে লড়্‌তে ভয় পাবে। ওই অভিশাপের ভয়ে মানুষ মৃত্যুকে জয় কর্‌বে না?—সুখ দুঃখ! চেয়ে দেখ আজ পৃথিবীর দিকে। প্রকৃতির উপরে মানুষের আধিপত্য-বিস্তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাজার আবিষ্কার। বল্‌তে পার, এতে মানুষের সুখ বেড়েছে না দুঃখ বেড়েছে? হাজার বছর আগের তুলনায় আজ পৃথিবীতে হাসির ঝঙ্কারই বেশী কানে আস্‌ছে, না অশ্রুর ঝর্ ঝর্ শব্দই বেশী কানে বাজ্‌ছে? ইয়োরোপে যে পৈশাচিক অভিনয় হ'য়ে গেল—কি আসে যায় তা'তে! মানুষ অগম্যকে গম্য করেছে, অনায়ত্তকে করায়ত্ত করেছে—এইটেই মানুষের বড় কথা—তা'র অন্তরতম কথা। না সুন্দরি, মানুষ সুখ-সোয়াস্তিকেই একান্তভাবে পূজ্য দেবতা করে' তোলে নি। মৃত্যু তার অনায়ত্ত তাই সে মৃত্যুকে ব্যাহত কর্‌তে চায়। এই জয়ের গৌরবই তার মুখ্য লক্ষ্য—জীবনের সুখ-সোয়াস্তি নয়।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে ভুবন দত্ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন—সহসা আপনাকে সম্বরণ করে' নিলেন। তারপর মৃদু হাস্যে বল্‌লেন—"মৃত্যু, এইবার তোমার মৃত্যু—অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দাও।"

মৃত্যু এতক্ষণ এক দৃষ্টে হার্পের তারগুলোর দিকে চেয়েছিল—যেন ভুবন দত্তর শেষের কথাগুলো তার কানেই যায় নি। হঠাৎ সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে মৃত্যু তার দুই চোখের পূর্ণ দৃষ্টি ভুবন দত্তর মুখের উপর সংহত কর্‌ল। বৃদ্ধের সারা দেহে মুহূর্ত্তের জন্য একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ চারিয়ে গেল। বৃদ্ধ অনুভব কর্‌ল মৃত্যুর চোখের তারায় একটা কৌতুক মিশ্রিত হাসি ফুটে উঠেছে। মৃত্যু বল্‌লে—"বৃদ্ধ, ঐ পূর্ণ গেলাস মৃত-সঞ্জীবনীর কথা ছেড়েই দাও—ওর একটি বিন্দুর মাঝে যে প্রাণশক্তি সংহত হ'য়ে আছে তা কি তোমার ঐ প্রাচীন শরীর, জীর্ণ অস্থি, নিস্তেজ মাংসপেশী ধারণ কর্‌তে পার্‌বে? জানই ত মন্ত্র লাভ হলেই হয় না তা ধারণের সামর্থ্য থাকা চাই। যদি শরীরের ধারণ-সামর্থ্য না থাকে তবে মৃত-সঞ্জীবনী যে উল্‌টো ফল দেবে!"

অবিশ্বাসের হাসি হেসে বৃদ্ধ উত্তর কর্‌লেন—"সুন্দরি! এ দেহের ধারণ-সামর্থ্য আছে কি নেই তা মৃত-সঞ্জীবনী পান না করে' ত বোঝা যাবে না। পরীক্ষা কর্‌বার আর কোন উপায় আছে?"

—"উপায় আছে।"

—"আছে?"

—"আছে বই কি। বৃদ্ধ, তোমার চোখের দৃষ্টি আমার দৃষ্টির সঙ্গে নিবদ্ধ কর দেখি।"

বৃদ্ধ তাঁর অচঞ্চল দৃষ্টি রমণীর দুই চোখে স্থাপিত করলেন।

মুহূর্ত্ত পরে রমণী জিজ্ঞেস করল—"ভুবন দত্ত, কি দেখ্‌ছ?"

—"কিছুই দেখ্‌ছি না।"

—"কিছুই দেখ্‌ছ না?"

—"না—আমার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'য়ে আস্‌ছে।"

রমণী হেসে উঠল—বল্‌লে—"বৃদ্ধ, তোমার চোখের চশমা ফেলে দাও!"

বৃদ্ধ তাঁর চোখের চশমা খুলে নিলেন। বিস্ময়ে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। তাঁর দুই চোখে যৌবনের সতেজ দৃষ্টি।

বৃদ্ধ দেখ্‌লেন তাঁর সম্মুখে পরিপূর্ণ যৌবনা স্থগঠিতা নয়নারাম রমণী মূর্ত্তি। তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একটা স্থষমাময় ছন্দ—একটা মূর্ত্তিময়ী রাগিণী—একটা পরিপূর্ণ কাব্য। যৌবনের দৃষ্টি নব-যৌবনাকে একেবারে নিকটে এনে ফেলেছে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন—"রমণী, তোমার চোখে কি আছে?"

রমণী উত্তর করলে—"বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণশক্তি আমার মধ্যে সংহত।"

—"তুমি কে?"

—"আমি মৃত্যু।"

—"না—না—স্থন্দরি, তুমি জীবন।"

—"হাঁ—আমিই জীবন—আবার আমিই মৃত্যু"—বল্‌তে

বল্‌তে মৃদুহাসির রঙীন্ রাগে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করে' মৃত্যু তা'র বক্ষের উপর থেকে স্বর্ণ-সূত্রের নির্ম্মিত আঁচলি ধীরে ধীরে অপসারিত কর্‌ল। ব্যক্ত হ'ল দুখানি পরিপূর্ণ নিটোল সুডোল বক্ষ। যেন দুটি রক্তকমল বিকশিত হ'তে চাচ্ছে।—বৃদ্ধের চক্ষে আর পলক পড়্‌ল না।

বৃদ্ধের বাঁকা দেহযষ্টি ধীরে ধীরে সোজা হ'য়ে উঠ্‌ল—তাঁর গণ্ডের মাংশপেশী সজীব হ'য়ে উঠ্‌ল—তাঁর ধমনীতে ধমনীতে যেন কত কাল থেকে বদ্ধ-স্রোত শোণিতে আবার বেগ জাগ্‌ল—তাঁর শিথিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নব-চেতনার স্পন্দন স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল।"

রমণী জিজ্ঞেস কর্‌ল—"বৃদ্ধ, কি দেখ্‌ছ ?"

যেন অর্দ্ধ মত্ত অবস্থায় যৌবনের সুর কণ্ঠে নিয়ে ভুবন দত্ত উত্তর দিলেন—"দেখ্‌ছি—দেখ্‌ছি—পঞ্চাশ বছরের আগের কথা—প্রতি তরুণীর চোখে চোখে প্রেমের ছবি—নিবিড় জ্যোছনা উঠেছে—নিবিড়—নিবিড়—নিবিড়—হাস্নাহানা ফুটেছে ঝোপে ঝোপে—থোকে থোকে—তারি সৌরভে সৌরভে দিক্ পাগল হ'য়ে উঠ্‌ল—ঐ যে পাখী ডাক্‌ছে—কোকিল—না না কোকিল নয় পাপিয়া—পাপিয়া ডাক্‌ছে জোছনা-নিবিড় নিশীথে—কে চায় কা'কে ?—কেউ জানে না—কেবল বিরহ—অনন্ত বিরহ—প্রতি তরুণীর চোখের পাতে বিরহ—হৃদয়-তলে মিলন-আশা—দিকে দিকে যৌবন জেগেছে গান উঠেছে সুর ফুটেছে—বিরহ আর মিলন—মিলন শেষ হ'য়ে যায়—বিরহের আর শেষ হয় না ··· রমণী তোমার বুকে কি আছে ?"

রমণী উত্তর কর্‌ল—"বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণশক্তি আমার মধ্যে সংহৃত, বৃদ্ধ!"

—"তুমি কে?"

—"আমি মৃত্যু।"

—"না—না—সুন্দরি তুমি জীবন।"

—"হাঁ—আমিই জীবন, আবার আমিই মৃত্যু"—মোহন হাসিতে মৃত্যুর চুনির মতো লাল অধরোষ্ঠ রঞ্জিত হ'য়ে উঠ্‌ল—হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যু স্বর্ণসূত্রে বোনা পরিধান-বস্ত্র অপসারিত করে' দূরে নিক্ষেপ কর্‌ল।

ভুবন দত্তর সম্মুখে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণশক্তির নগ্ন-প্রতীক পরিব্যক্ত হ'ল।

বৃদ্ধের ধমনীতে শোণিত-স্রোত দশ গুণ বেগে ছুট্‌তে লাগ্‌ল—স্নায়ু সব ফুলে উঠ্‌ল—হৃদ্‌পিণ্ডটা বক্ষ পঞ্জরের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল—যেন তা বিপুল প্রাণস্পন্দনে চৌচির হ'য়ে ফেটে যাবে—সর্ব্বশরীর ঘিরে একটা বিদ্যুতের বেগের তোড় যেন তাঁর শরীরের পেশীগুলোকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে' দেবে—তাঁর দেহের অস্থি-শৃঙ্খলার গ্রন্থি ছিন্ন-ভিন্ন করে' ফেল্‌বে। বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ থর্‌ থর্‌ করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

মৃত্যু জিজ্ঞেস কর্‌ল—"ভুবন দত্ত, কি দেখ্‌ছ?

উত্তেজিত-কণ্ঠে ভুবন দত্ত বলে' উঠ্‌লেন—"দেখ্‌ছি—দেখ্‌ছি—আরও দশ বছর আগের কথা—নব যৌবনের ডাক এসেছে—

ঐ যে বাঁধ ভাঙ্গ্ছে—ফুলের বুক খুল্ছে—ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ ফুট্ছে—ঐ যে দেখ্ছি—দেখ্ছি······সুন্দরি, তুমি কে?"

—"আমি মৃত্যু।"

—"না—না—তুমি জীবন—তুমিই জীবন"—ভুবন দত্ত টল্তে টল্তে অগ্রসর হ'লেন দুই বাহু প্রসারিত করে' যেখানে সুন্দরী দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানে—তারপর আপনার ব্যগ্র প্রসারিত বাহুর মাঝে মৃত্যু-সুন্দরীকে জড়িয়ে নিলেন।

হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ—একটা নিষ্ঠুর অট্টহাসিতে কক্ষ পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। কোথায় রমণী, কোথায় সুন্দরী—কোথায় কে? বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ একটা তুহিন-শীতল বায়বীয় পদার্থে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। সেই তুহিন স্পর্শ লেগে ভুবন দত্তর স্নায়ুতে স্নায়ুতে খরতর শোণিত-বেগ চক্ষের পলকে জমাট বেঁধে গেল—তাঁর অস্থির মজ্জায় মজ্জায় শিহরণ হান্ল। ভুবন দত্ত হুম্ড়ি খেয়ে কক্ষতলে লুটিয়ে পড়্লেন। আর উঠ্লেন না।

চারিদিক নিস্তব্ধতায় ভরে' উঠ্ল। কেবল একটা চাপা হা হা অট্টহাসি কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে গিয়ে গিয়ে দূর নিশীথ আকাশে মিশিয়ে গেল।

*　　*　　*　　*

পরদিন ভুবন দত্তর একমাত্র বৃদ্ধ ভৃত্য গিয়ে আবিষ্কার কর্ল তার মনিব কক্ষতলে মুখ থুব্ড়ে পড়ে' আছেন। গায়ে উত্তাপের লেশমাত্র নেই। ডাক্তারের কাছে খবর গেল। ডাক্তারেরা

এলেন। মৃতদেহ পরীক্ষা করে' বল্‌লেন যে কোন কারণে হৃদ্‌পিণ্ডের অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে মৃত্যু ঘটেছে।

ছোট টেবিলটার উপরে মৃত-সঞ্জীবনী পরিপূর্ণ গেলাসটা ডাক্তারদের চোখে পড়্‌ল। বস্তুটি কি তাঁরা কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌লেন না। তাঁরা সেটা পরীক্ষা করবার জন্যে নিয়ে গেলেন। তাঁদের রসায়নাগারে পরীক্ষা করে' দেখ্‌লেন যে ঐ স্বর্ণাভ তরল পদার্থ এক প্রকারের সাংঘাতিক উগ্র বিষ—যা কি প্রাচ্যের কি পাশ্চাত্যের চিকিৎসাশাস্ত্রে একেবারেই অপরিজ্ঞাত।

চিরন্তনী

চোদ্দ বছর বয়সের সময় হঠাৎ সে একদিন যেন কেমন হ'য়ে গেল—তার দেহের অস্থিরতা মনের চাঞ্চল্য সব যেন কোথায় লুকিয়ে গেল—তার খেলাধূলোয় প্রবৃত্তি, গালগল্পের সুখ, সমবয়স্ক সঙ্গীদের সঙ্গে মারামারি হুড়োহুড়ি কর্‌বার প্রলোভন সব যেন কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ছেলেরা ডাক দিয়ে যায় সে-ডাক তার কানেই পৌঁছয় না। বন্ধুরা এসে খোসামোদ করে, তা'তে সে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। চারিদিকের কর্ম্ম ও খেলার চাঞ্চল্যের মাঝে সে নির্ব্বাক ও উদাসীন। দেখে-শুনে পাড়াপড়সীরা তার নাম রাখ্‌ল ক্ষ্যাপা।

ক্ষ্যাপা আপনার ছোট্ট ঘরটির মধ্যে একা বসে' বসে' থাকে আর ভাবে কোথায় যেন একটা কি রহস্য আছে যেটা ভেদ কর্‌তে পার্‌লেই———

ভেদ কর্‌তে পার্‌লেই—কি হবে? তা শত চেষ্টাতেও ক্ষ্যাপার মনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না—কেবল রহস্যের নিবিড়তাই আরও নিবিড় হ'তে থাকে—তার উদাসী মন আরও উদাসী হ'য়ে যায়।

ক্ষ্যাপার অবসরেরও বিরাম হয় না, আকুলতারও শান্তি হয় না।

ফাগুন মাসে আমের গাছ সব মুকুলে মুকুলে ভরে' যায়, তার মিষ্টি মৃদু গন্ধে আকাশ বাতাস মেতে ওঠে, মৌমাছিদের গুঞ্জন-প্রলাপে চারিদিকের নীরবতা অস্থির হ'য়ে ওঠে। ক্ষ্যাপা চোখের দৃষ্টি নিবিড় করে' চেয়ে থাকে আর অস্পষ্ট হ'য়ে কেমন যেন তার মনে লাগে রহস্যের বুঝি কিনারা হয়-হয়—সহজ কথাটার সন্ধান বুঝি সে পায়-পায়। তারপর ফাগুনের খেলা ভেঙে যায়—আমের মুকুল কুঁড়ি বেঁধে সবুজ হ'য়ে ওঠে, মৌমাছিরা আপনার বন-ভবনে ফিরে যায়—রহস্যের আর কিনারা হয় না—ক্ষ্যাপার কৌতুহলই কেবল বেড়ে ওঠে।

বৈশাখী-সন্ধ্যায় কাল-বোশেখীর কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়—সাদা বকের সার কালো মেঘের বুক দিয়ে উড়ে যায়—ঘূর্ণী বাতাস শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে উড়িয়ে আকাশে ওঠে—শন্ শন্ শব্দে বৃষ্টি নেমে আসে—কচুপাতার উপর দিয়ে স্ফটিকের মতো জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে—ক্ষ্যাপা এক মনে চেয়ে থাকে আর ভাবে ঐ বুঝি গোপন কথাটা স্পষ্ট হ'য়ে আসে-আসে—কিন্তু মেঘ কেটে যায়, বৃষ্টি থেমে যায়, রাত্রি-শেষে দিনের আলোয় চারিদিক স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—রহস্যের আর কোন কিনারা হয় না—গোপন-কথাটা গোপনই থেকে যায়।

এম্‌নি করে' বছরের পর বছর কাটে—রহস্যেরও আর কিনারা মেলে না—ক্ষ্যাপারও আর সোয়াস্তি হয় না। ক্ষ্যাপা ভাবে রহস্যের অনুসন্ধান বৃথা।

সেদিন সিউলি তলার সিউলি ফুলের রাশ ক্ষ্যাপার মনকে বিশেষ করে' উদাসী করে' দিলে—রাজার বাগান থেকে বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসে—স্তব্ধ নিঝুম দুপুর বেলা রাখালের বাঁশীর সুর একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার ব্যথা নিয়ে নিয়ে ফেরে।

ক্ষ্যাপার সে দিন হঠাৎ চোখে পড়ল এক বালিকা। তন্বী তার তনুলতা, কালো তার চোখ, নিবিড় তার কেশ—সারা দেহে তার থম্‌কে থাকা প্রাণের চাঞ্চল্য।

ক্ষ্যাপা চম্‌কে উঠ্‌ল—বালিকার চোখের দিকে তাকাতেই ক্ষ্যাপার হৃদয়টা স্ফীত সিন্ধুর মতো স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ল—ক্ষ্যাপা ভাব্‌লে—এইবার রহস্যের সন্ধান পেয়েছি।

কিন্তু রহস্যের কিনারা আর হয় না। বালিকা বকুলফুলের মালা গেঁথে পরে, কাঁচ্‌পোকার টিপ লাগায়, কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী দিয়ে কানের দুল তৈরী করে—তা'তে রহস্য কেবলই নিবিড় থেকে নিবিড়তর হ'তে থাকে—বালিকা তার সারা দেহের বর্ণ রেখা ও সুর দিয়ে কি যেন একটা কথা বল্‌তে চায়—কি যেন একটা সন্ধান জানাতে চায়—সেটা আধ স্পষ্ট আধ অস্পষ্ট থেকে ক্ষ্যাপার অসোয়াস্তিই আরও বাড়িয়ে তোলে—রহস্যের আর কূল-কিনারা হয় না।

ক্ষ্যাপা ভাব্‌লে বালিকার সঙ্গে মিলন হ'লে রহস্যের কিনারা হবে।

ক্ষ্যাপার সঙ্গে বালিকার মিলন হ'ল।

কিন্তু যে রহস্য ধরা-দেওয়া-দেওয়ার মতো হয়েছিল তা কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। পুরুষের স্পর্শে বালিকা এক মুহূর্ত্তে নারী হ'য়ে জেগে উঠ্‌ল—পৃথিবীর বুক আঁক্‌ড়ে সেখানে ঘর বেঁধে বস্‌ল।

নারী একদিন ক্ষ্যাপাকে বল্‌লে—দেখ তুমি যে রহস্যের সন্ধানে ফির্‌ছ সে রহস্যের আবির্ভাব হবার সময় এসেছে—আমি তার ব্যথা ও আনন্দ অনুভব কর্‌ছি।

ক্ষ্যাপা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস কর্‌ল—কোথা থেকে তার আবির্ভাব হবে?

নারী বল্‌লে—"আমার কামনা থেকে—আমার মৃত্যু থেকে।

নারীর পাশে এসে উদয় হ'ল এক ক্ষুদ্র শিশু।

শিশুর কৌতূহল-বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষ্যাপা ভাবলে—হাঁ, এইবার পেয়েছি, এইবার বুঝেছি।

কিন্তু ক্ষ্যাপা কিছুই পায় নি, কিছুই বোঝে নি—যেমনকার রহস্য তেম্‌নি র'য়ে গেছে। ধীরে ধীরে শিশু বালক হ'ল, কিশোর হ'ল, যুবক হ'ল, যৌবন কাটিয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পড়্‌ল। ক্ষ্যাপা দেখ্‌লে রহস্য কিছুমাত্র স্পষ্ট হয় নি।

ক্ষ্যাপা মৃত্যু-শয্যায়। বিধাতা পুরুষ এসে বল্‌লেন—"অনুসন্ধানী! রহস্যের কিনারা পেলে?"

ক্ষ্যাপা কষ্টে শেষ-নিশ্বাস টেনে বল্‌লে—"রহস্যের কিনারা কে চায়? আমি আজ মরছি কারণ রহস্যের নেশা আমার চোখ থেকে কে অপসারিত করে' নিয়েছে। আর আমার চল্‌বার পথ নেই, চল্‌বার প্রয়োজন নেই।"

দিল-মহলের গল্প

অতি মোলায়েম অতি মিষ্টি যেন সোহাগ-মাখানো একটা সারেঙ্গীর সুর জুলেখার কানে এসে বাজ্‌ল। জুলেখা দূরাগত-বেণুরব-শোনা-হরিণীর মতো চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল—ডালিমের রসে রাঙান ছোট্ট পা দুখানি হিঙ্গুলের মতো লাল মখমলের চটিতে ত্রস্তে ঢুকিয়ে দ্বারের কাছে এসে নৈরাশ্য-ব্যাকুলতা মিশ্রিত কণ্ঠে ডাক্‌ল—"বাঁদী, বাঁদী!"

বাঁদী তার আঠার বছরের দেহভঙ্গী নিয়ে চোখের কোণের হাসির নেশা নিয়ে ঠোঁট দুখানিতে রঙীন্ অবসরের তৃপ্তির অবলেপ নিয়ে এসে জুলেখাকে কুর্নিশ করে' দাঁড়াল। জুলেখা বল্লে—"বাঁদী, সারেঙ্গীর সুর শুনেছিস্? কোথা থেকে আস্‌ছে জানিস্?"

—"বিবি-সাহেবা নীচে যমুনায় কার নৌকো যায়, সেই নৌকোয় কে সারেঙ্গী বাজাচ্ছে—এ তারি সুর।"

জুলেখা বল্লে—"বাঁদী যমুনার দিকের জান্‌লা খুলে দে—আমি দেখ্‌ব।"

—"ও-দিকের জান্‌লা যে খোল্‌বার হুকুম নেই বাদসার, বিবি-সাহেবা!"

—"বাদসার হুকুম যাতে পাস্ তাই করিস্"—জুলেখা তার আঙুল থেকে কলিজার রক্তের মতো লাল চুনি বসান' একটা আংটী খুলে' বাঁদীর হাতে দিলে—বল্‌লে—"এতেও কি বাদসার হুকুম পাবি নে?"

বাঁদী পাতলা ঠোঁটে রঙীন্ হাসি এনে চোখের কোণে একটা নিরর্থক কটাক্ষ টেনে বল্‌লে—"বাদসার হুকুমের জন্য ভাবনা কি বিবি-সাহেবা—আপনার রূপের গুণে যে জান্‌লা বন্ধ হয়েছে, আপনার রুপেয়ার টানে আবার তা খুল্‌বে—বাতায়ন আমি খুলে' দিচ্ছি।"

বাদসার হাজার-দুয়ারী বিলাস-ভবনের হাজার চাবীর গোছা থেকে একটা চাবী বেছে বাঁদী বাতায়নের কপাট খুলে' দিলে।

নীচে নৃত্যরতা কিশোরী যমুনা। গোধূলির সোনালি সোহাগে বুক তার রাঙা হ'য়ে উঠেছে। দেহে তার রূপের জোয়ার, প্রাণে তার নেশার জোয়ার—দু'কূল ছুঁয়ে তার যৌবনের টান মুক্তির বান।

সেই রূপের জোয়ারে নেশার জোয়ারে যৌবনের জোয়ারে মুক্তির জোয়ারে একখানি ছোট্ট নৌকো ভেসে চলেছে যেন আপন মনে। সেই নৌকোর ছইয়ে বসে' এক কিশোর যুবক, হাতে সারেঙ্গী, কণ্ঠে গজল।

গজল বল্‌ছিল—

ওরে দরদী তোরে ধরে' রাখ্‌লে আমি ব্যথা পাই—তোরে ধরে' রাখ্‌তে গেলে তোর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়—তোর চোখের কোণে অশ্রু জাগে—

তোর অভিমানের স্বর এমনি করুণ হ'য়ে বাজে—ওরে দরদী—ওরে যাদুকর……

ওরে দরদী তোরে ছেড়ে দিয়ে আমি স্বস্তি পাইনে—তোরে ধরে' রাখ্‌লে তুই শুকিয়ে উঠিস্, তোকে ছেড়ে দিলে তুই মৃত্যু পানেই ছুটিস্—তবুও তোর চলার নেশা থামে না—ওই চলাই যে তোর মৃত্যু, আবার জীবন—ওরে দরদী—ওরে যাদুকর……

পতঙ্গকে যে আগুনে পুড়তেই হবে—তবু ও-রঙীন্ নেশার সুখ সে কেমন করে' ছাড়বে? থামার মাঝে অমৃত নেই, চলার মাঝে মৃত্যু আছে—এ তোর কি কৌতুক—ওরে দরদী—ওরে যাদুকর……

সারেঙ্গীর স্বর, গজলের কথা, আর যুবকের যৌবন-শ্রী, এই তিনে মিলে জুলেখার অন্তরের কতদিনের-সুপ্ত বনের হরিণটি মাথা তুল্‌ল—ওরে

"সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধল অকারণে।"

ওই যে যমুনার ওপারে সবুজ-বনানীর গাঢ় ছায়া সে আজ কি নিবিড় মায়া জুলেখার মনে মনে বিছিয়ে দিলে—বাদসা এই ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত প্রমোদ-ভবন এ যেন রাশি রাশি কঙ্কালের একটা বোঝা, এর ঐশ্বর্য্য এর সুখ এর স্বাচ্ছন্দ্য কি অর্থহীন—এর চাইতে ঐ সবুজ বনের কালো ছায়া, স্তব্ধ দুপুরের মৌমাছি-গুঞ্জন, বাতাসে ভাসা বনফুলের গন্ধ, সে কি সুখের কি তৃপ্তির কি সার্থকতার—এ সুখ এ তৃপ্তি এ সার্থকতার পাশে ধীরে ধীরে জুলেখার অন্তরে ভেসে ওঠে যুবকের যৌবন-শ্রী-মণ্ডিত-মুখ……

সারেঙ্গীর স্বর, গজলের কথা, আর যুবকের যৌবন-শ্রী এই

তিনে মিলে জুলেখার অন্তরের কতদিনের-সুপ্ত বিহঙ্গমকে জাগ্রত করল—

"আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী।"

ওই যে আকাশ-ছাওয়া রক্ত-সন্ধ্যা ঐ যে নিবিড় নীল, সে কি সুন্দর কি মহান্—বাদসার এই যে মুক্তি-কুণ্ঠিত বিলাস-ভবন এ যেন রোগক্লিষ্ট একটা বিভীষিকা—এর পুষ্পবীথি, এর হাস্য-মুখর ঝরণার ধারা, এর ফুলের গন্ধ, কি একটা বিরাট দৈন্য-ঘেরা প্রাণ-হীনতা—ঐ যে আকাশের নিবিড় নীলিমা, ঐ যে দিগন্তের নিমন্ত্রণ, ঐ যে অশেষ-পথের আভাস মুক্তির সঙ্গীতে সে কি সম্পদশালী, হৃদয়ের সঙ্গীতে সে কি ভরপুর, নৃত্যে নৃত্যে সে কি উল্লাসময়—এ সুখ এ সঙ্গীত এ উল্লাসের পাশে ধীরে ধীরে জুলেখার অন্তরে ভেসে ওঠে যুবকের যৌবন-শ্রী-মণ্ডিত-মুখ……

সারেঙ্গীর সুর, গজলের কথা, আর যুবকের যৌবন-শ্রী এই তিনে মিলে আজ জুলেখার অন্তরে সুখের কার্পণ্যের চাইতে ব্যথার আনন্দকে গরীয়ান্ করে' তুলল—এই বিরাট বিলাস-ভবন, হৃদয়-ছেঁচা-মাণিক ত এর কোনখানেই নেই—কক্ষে কক্ষে এর পুরু গালিচা, দেয়ালে দেয়ালে বহুমূল্য দেয়ালগিরি, দিকে দিকে আরশি—এ যে কেবল আশরফিরই ভারে ভারাক্রান্ত—এর চাইতে বনের ছায়া কাননের মায়া আকাশের নীলিমা দিগন্তের ডাক্ কি মর্ম্মস্পর্শী কি ব্যথা-ভরা সুখের—এ সুখের পাশে জুলেখার মনে জেগে ওঠে যুবকের যৌবন-শ্রী-মণ্ডিত-মুখমণ্ডল, তার

প্রশস্ত ললাট, কুঞ্চিত কেশ-কলাপ, সুবঙ্কিম ভ্রূ, গভীর-দৃষ্টি আঁখি।

নৌকো যমুনার বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল—বাঁকের মুখে একটা অপেক্ষার আভাস রেখে—একটা আমন্ত্রণের ইঙ্গিত রেখে।

জুলেখা বল্‌লে—"বাঁদী এই যুবক কে জানিস্?"

হাসির রঙে রঙীন্ করে' বাঁদী উত্তর দিলে—"তা আর জানিনে বিবি-সাহেবা—তা না জান্‌লে কি আমাদের চলে।"

—"তোর বক্তৃতা শোন্‌বার আমার অবসর নেই বাঁদি—জানিস্ ত বল।"

ঠোঁট দুখানিতে সিরাজির নেশা ঢেলে' বাঁদী বল্‌লে—"বাদসার দরবারে তাসকান্দের যে নতুন রাজদূত এসেছে এ তারি ভাগ্‌নে, নাম সৈয়দ মহম্মদ আফজল ওস্‌মান আলি।"

—"এঁকে একবার এখানে আন্‌তে পারিস্?"

—"সে কি বিবি-সাহেবা! এখানে ত বাইরের কোনো পুরুষকে নিমন্ত্রণ কর্‌বার হুকুম নেই, বাদসার!"

—"এই হুকুমটা কি আর বাদসার কাছ থেকে আদায় করতে পারবি নে"—জুলেখা তার হৃদয়ের উপরকার মণিহার খুলে' তার হাতে দিলে—রং তার জুলেখার চোখের তারার মতোই গভীর নীল, তা জুলেখার চোখের তারার মতোই বিদ্যুৎ ক্ষরণ করে—বল্‌লে—"এতেও কি তোর হুকুম মিল্‌বে না?"

—"খুব মিল্‌বে বিবি-সাহেবা—আপনার রূপের জ্বালায় যে-হুকুম রদ হয়েছে, আপনার এই কণ্ঠমালায় আবার সে-হুকুম মিল্‌বে। ওস্‌মান আলিকে কবে আন্‌তে হবে?"

—"বাদসা পরশু আস্‌বেন না। ওঁকে পরশু আনিস্।"

—"বহুৎ খুব বিবি-সাহেবা"। বাঁদীর পাত্‌লা ঠোঁটের কোণে বিদ্যুতের মতো' একটু হাসি খেলে গেল। সে-হাসিতে প্রচ্ছন্ন ছিল সমরকন্দে তৈরী তর্‌তরে ধারওয়ালা গুপ্ত-ছুরির সূক্ষ্মাগ্র ভাগের শিহরণ-হানা একটুকু চিকিমিকি।

২

দুই হাটুর মধ্যে কোষবদ্ধ তরবারী রেখে হাব্‌শী ঢুল্‌ছিল—ঘাঘরার খস্ খস্ শব্দ পেয়ে হাব্‌শী চোখ মেল্‌ল—বাঁদীকে দেখে তার জোঁকের মতো ঠোঁটদুটোর মাঝে মুক্তোর মতো দু'সার দাঁত জেগে উঠ্‌ল। জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কে তুই? বাদসার খাস কামরায় তোর কি দরকার?"

রেশমী আঙরাখায় ঢাকা বুক দুটোকে আরও ফুটিয়ে তুলে' মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত কটির দু'দিকে ন্যস্ত করে' পাতলা ঠোঁটে গাম্ভীর্য্য এনে বাঁদী বল্‌লে—"নাম আমার পিয়ারী বেগম, পেশা বাদসার বিলাস-ভবনের খাস্ বাঁদী, জন্মস্থান ইরাক্, বিক্রীতস্থান সিরাজের বাজার, হাল সাকিন দিল-মহল, ভারত সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাজ্ঞী—দরকার বাদসার সঙ্গে রাজকার্য্য আলোচনা।"

হাব্‌শী তার বিকট মুখ হাসিতে আরো বিকট করে' তুলে' বল্‌লে—"ভারত সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাজ্ঞী! আমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবি না ত?"

—"খাওয়াব না! তোকে আর জহর বেগমকে এক সঙ্গে সবার আগে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।"

—"কেন আমার আর জহর বেগমের উপর তোর কি রাগ?"

—"তুই আবলুশের মতো একটা হাব্‌শী আমার সঙ্গে ইয়ারকি দিস্ তাই তোর ওপর রাগ—আর জহর বেগম ধুত্‌রোফুলের মতো সাদা একটা ইহুদি আমার সঙ্গে ইয়ারকি দেয় না তাই তারও ওপর রাগ। সর্ পথ ছাড় বাদসা আমায় ডেকেছেন।"

হাব্‌শী উঠে দরজার পরদা সরিয়ে ধর্‌ল—পিয়ারী বাদসার খাস্ কামরায় প্রবেশ কর্‌ল।

বাদসা একটা প্রকাণ্ড সাদা ইরাণী বেড়ালকে কোলে নিয়ে তার গলায় একটা মুক্তোর মালা পরিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ছিলেন—আর বেড়ালটা সে মালার কোন অর্থ না পেয়ে ঘোরতর আপত্তি কর্‌ছিল।

তাঁর বিলাস-ভবন দিল-মহলের খাস্ বাঁদীকে দেখে বাদসা বেড়ালের সঙ্গে খেলা থেকে বিরত হলেন—জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"কিরে বাঁদী, খবর কি?"

বাঁদী বিদ্রূপের ভঙ্গীতে আভূমি-প্রণত একটা কুর্নিশ করে' বল্‌লে—"জনাব—জাঁহাপনা—খোদাবন্দ—খবর খারাপ।"

—"তোদের দেশে খারাপ খবর জন্মায় নাকি রে বাঁদী?"

—"তা আর জন্মায় না জাঁহাপনা! যেখানে শিরীন্ প্রাণ জরীন্ রূপ, যেখানে যৌবনের ছন্দ সিরাজীর গন্ধ, যেখানে দিবসের অবসর নিশীথের স্বপ্ন—খারাপ খবর জন্ম নেবার স্থানই ত সেখানে।"

—"বাঁদী তুই যে কেন গজল লেখা সুরু করিস্ নি বুঝিনে—কর্‌লে চাই কি তুই একটা দিল-মহলের বাঁদী না হ'য়ে দুনিয়ার দিলের যাদুকর হ'য়ে উঠ্‌তিস্—হাফেজ ফারদৌসির মতোই অমর হ'য়ে যেতিস্।"

—"অমরত্বের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র টান নেই জাঁহাপনা! আমার সমস্ত আকর্ষণ মর্ত্ত্যের প্রতি। যা থাক্‌বে না, যা লয় হবে, যা দু'দিনের, তার যে বেদনা সে বেদনার যে-সুখ আমার জীবনের সমস্ত লোভ সেই বেদনা সেই সুখের জন্য। যে ফুলের পাপড়ি ঝরে' যায়, যে সিরাজীর নেশা উবে যায়, যে যৌবনে ভাঁটা পড়ে, যে বসন্ত নিদাঘ-ক্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে তাই-ই আমার চোখে রঙীন্! অমর হবার ইচ্ছা, দুনিয়াতে স্থায়ী ডেরা বাঁধার ইচ্ছা—জনাব, আপনার দিল-মহলের বাঁদীর সে ইচ্ছা নেই। যে ঠোঁটে হাসি অবিরাম লেগে আছে চিরদিন লেগে থাক্‌বে সে ঠোঁট ত অমূল্য নয় সে ঠোঁট আমার কাছে মূল্যহীন।"

—"বাঁদী তোকে দরবার করে' আমি কবির খেতাব ও খেলাৎ দেব। এ সব কথা তোকে কে শিখিয়েছে?"

বাঁদীর ধনুকের মতো ভ্রূর নীচে টানা দু চোখের কাল-বোশেখীর মেঘের মতো নিবিড় কালো তারা রোদ-পড়া ইস্পাতের ছুরীর মতো ঝক্ ঝক্ করে' উঠ্‌ল—বল্‌লে—"শিখিয়েছে আমার জীবনের নেশা—আমার ভোগের নেশা—জাঁহাপনা, আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে শোণিত রিরি কর্‌তে থাকে যখন দেখি আপনার খাস-মহলে আপনার দিল-মহলে—— "

বাঁদী হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে' হাল্‌কা হাসির স্বর মিশিয়ে বল্‌লে “——জাঁহাপনা আপনার দিল-মহলের চিঁড়িয়া উড়ু উড়ু।”

—“বলিস্‌ কি বাঁদী! এই ঘন বাদলে?”

—“পিঁজরার চিঁড়িয়ার কি আর বসন্ত-বাদল দেখবার অবসর থাকে, জাঁহাপনা?”

—“তবু বাদলেই চিঁড়িয়া উড়্‌বে?”

—“পিঁজরার সুখ কবে বাদলের দুঃখের চাইতে সুখের বাদসা?”

—“চিঁড়িয়ার নাম?”

—“নাম জুলেখা-বানু, বাদসার দিল-বাহার বেগম।”

জুলেখা-বানুর নাম শুনে' বাদসা কোলের বেড়ালটাকে গালচের উপর ছুঁড়ে ফেল্‌লেন—বেড়ালটা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মাথা উল্‌টিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পিঠ চাট্‌তে লাগ্‌ল। বাদসা সোজা হ'য়ে বসে' ক্রোধের স্বরে বল্‌লেন—“বাঁদী, তুই ঝুটবাৎ শিখেছিস্‌।”

—“তাস্‌কান্দের নতুন রাজদূত মিরজা আলির ভাগ্নে খাপসুরত নবীন যুবক ওস্‌মান আলি দিল-মহলে আমন্ত্রিত জাঁহাপনা।”

—“তোর গর্দ্দান যাবে বাঁদী জানিস্‌?”

—“দিল-মহলের দিল-বাহার বেগমের দিল ওস্‌মান আলির রূপ-সাগরে ভেসেছে জাঁহাপনা—ওস্‌মান আলি সে নৌকোয় পাল তুল্‌বে পরশু সন্ধ্যেবেলার মিঠে বাতাসে।”

—"তুই নেশা করেছিস্ বাঁদী ?"

হঠাৎ বাঁদী হাসির একটা মিঠে গিট্‌কিরিতে সমস্ত কক্ষ প্রতিধ্বনিত করে' মেঝে পর্য্যন্ত নত হ'য়ে একটা কুর্নিশ করে' বল্‌লে—"জাঁহাপনা বাঁদীর গোস্তাকি মাপ করুন—আমি ঠাট্টা করেছিলুম।"

বাদসা যেন ক্ষণকালের জন্য প্রকৃতিস্থ হলেন কিন্তু পরক্ষণেই একটা দারুণ সন্দেহ তাঁর চোখের পাতে ঘনিয়ে এলো—ছোট্ট চোখের তীব্র দৃষ্টি পিয়ারীর মুখের উপর নিবদ্ধ করে' বল্‌লেন—"বাঁদী, আবার মিথ্যে কথা সুরু করেছিস্—এ ঠাট্টা নয়, এ সত্যি।"

—"জাঁহাপনা এ ঠাট্টাও নয়, এ সাচ্চাও নয়—এ ঝুটা—ওস্‌মান আলির সঙ্গে জুলেখা-বানুর সাক্ষাৎ কেমন করে' হবে ?"

—"তোর গর্দ্দান যাবে জানিস্ বাঁদী—এ মিথ্যে নয়—এ সত্যি।"

—"এ যদি সত্যি হয় জাঁহাপনা তবে আপনার দিল-মহলের বাঁদী হাস্‌তে হাস্‌তে গর্দ্দান দেবে—না জাঁহাপনা, এ সত্যি নয় এ মিথ্যে।"

—"ঠিক বল্‌চিস্ ?"

—"আল্লার কসম, জাঁহাপনা।"

বাদসা স্মিত-হাস্যে মার্জ্জার-পরিত্যক্ত মুক্তোর মালাটা বাঁদীর হাতে দিয়ে বল্‌লেন—"বাঁদী তোর বখ্‌শিশ—কিন্তু খবরদার এমন ঠাট্টা আর করিস্ নে—কর্‌লে হাবশীর সঙ্গে তোর সাদী দেব।"

—"জাঁহাপনার দিলকে রঙীন্ রাখ্‌বার জন্যেই এমন ঠাট্টা মাঝে মাঝে করি জনাব।"

বাদসা ব্যাথাভরা-কণ্ঠে ধীরে ধীরে বল্‌লেন—"বাঁদী, তুই জানিস্ নে বয়স যত বাড়ে দিল তত পাকে—বাঁদী এখন তোর কাজে যা।"

বাঁদী নিষ্ক্রান্ত হ'ল। যাবার সময় হাব্‌শীকে একটা মিঠে নজর বখ্‌শিশ দিতে ভুল্‌ল না।

বাঁদীর ঠোঁটের কোণে গোপন মৃদু হাসি আর চোখের কোণে রুদ্র প্রলয়ের বহ্নি-লেখা।

বাদসা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কৌচে হেলে পড়্‌লেন। কিন্তু সে স্বস্তির ভাব তাঁর বেশীক্ষণ রইল না, ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে একটা অসোয়াস্তি জেগে উঠ্‌ল---ধীরে ধীরে তাঁর ললাটে চিন্তা-রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল—ঠোঁট দুটো কঠিন হ'য়ে উঠল—চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগ্‌ল—বাদসা সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লেন—তাঁর চোখ দুটো স্পষ্ট যেন ঘোষণা করতে লাগ্‌ল—খুন্—খুন্—খুন্। বাদসা কঠোর কণ্ঠে ডাক্‌লেন—"বা[illegible]।"

পরদা সরিয়ে তৎক্ষণাৎ হাব্‌শী এসে কুর্ণিশ করে' দাঁড়াল। বাদসা বল্‌লেন—"উজির।"

উজির এসে দাঁড়াতেই বাদসা বল্‌লেন—"উজির, পরশু সন্ধ্যেবেলা বাদসার কি মর্জ্জি?"

উজির বল্‌লেন—জাঁহাপনা, পরশু সন্ধ্যেবেলা তাস্‌কান্দের রাজদূতকে দাবাখেলার আমন্ত্রণ করেছেন বাদসা।"

বাদসা বল্‌লেন—"সে আমন্ত্রণ নাকচ উজির। আমার আর-কোন হুকুম নেই।"

—"জাঁহাপনার মর্জ্জিই আইন।"

উজির নিষ্ক্রান্ত হলেন। বাদসা শূন্য কক্ষে পায়চারী করে' বেড়াতে লাগ্‌লেন—উদ্বিগ্ন, উন্মনা, উত্তেজিত।

৩

দু'জনে নির্ব্বাক নিস্পন্দ—কৌচে উপবিষ্ট জুলেখা আর কক্ষের প্রবেশ-দ্বারের কাছে দণ্ডায়মান ওস্‌মান। বিরাট বিস্ময় ওস্‌মানের চোখে—একটা পরম আনন্দ-কম্পন দু'জনার বক্ষে—দু'জনার মুখে একটি কথা নেই—কেবল পরস্পরের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ যেন পরস্পর পরস্পরকে দৃষ্টি দিয়ে গ্রাস কর্‌তে চাচ্ছে।

দিল-মহলের ঝাউবীথি থেকে ময়ূর ডেকে উঠ্‌ল—দুজনার চমক ভাঙ্‌ল। জুলেখা যেন একটা পরম আকাঙ্খা কণ্ঠে নিয়ে বল্‌লে—"ওস্‌মান!"

ওস্‌মান ছুটে গিয়ে জুলেখার পায়ের কাছে গালিচার ওপরে বসে' পড়্‌ল—যেন তার সমস্ত হৃদয়টা—সমস্ত আত্মাটা সেইখানে লুটিয়ে দিলে। যেন তার সমস্ত অহঙ্কারকে জুলেখার পায়ের কাছে নত করে' গদগদ কণ্ঠে বল্‌লে—"রুবেয়া—তুমি—তুমি—আমি যে তোমায় কত খুঁজেছি। সেই বোগ্‌দাদে দেখা—তারপর আর-একবার ইস্পাহানে তোমায় দেখি—তারপর তুমি কোথায় অদৃশ্য হ'লে। তারপর শুন্‌লুম তুমি কাইরোতে। কাইরোতে গিয়ে

আমি তোমাকে তন্ন তন্ন করে' তিন বছর খুঁজেছি—তারপর হঠাৎ শুনি যে তুমি হিন্দুস্থানে, তাই আমিও হিন্দুস্থানে এসেছি। কিন্তু বাঁদী যখন জুলেখা-বানুর নাম কর্‌লে তখন ত আমি স্বপ্নেও ভাবি নি এই আমার রুবেয়া।"

একটা পরম বেদনা কণ্ঠে নিয়ে রুবেয়া বল্‌লে—"হাঁ ওস্‌মান আমি—আমি—রুবেয়া—আজ জুলেখা-বানুর নামে। কিন্তু জুলেখা-বানুর ছদ্মনাম ছদ্মবেশ যে আজ আমার কাছে বিষ হ'য়ে উঠেছে—এ ছদ্মবেশ ছদ্মনাম থেকে যে আমি মুক্তি চাই—ওস্‌মান, আমাকে উদ্ধার কর।"

ওস্‌মান চকিত-দৃষ্টিতে একবার কক্ষের চারিদিক দেখে নিলে, তারপর পরম আগ্রহ পরম ব্যাকুলতার স্বরে বল্‌লে—"এই ঐশ্বর্য্য—এই সম্পদ—এই সুখ—"

"সুখ!" তীব্রকণ্ঠে রুবেয়া বলে' উঠ্‌ল—"সুখ কোথায় ওস্‌মান? এই বন্দীশালে? আরবের মরুভূমিতে যার জন্ম—দিগন্তপ্রসারি আকাশ থেকে যে জন্ম হ'তে প্রাণবায়ু সংগ্রহ করেছে—যাবজ্জীবন যে মুক্ত মরুর বক্ষের উপরে ঘোড়া ছুটিয়ে খেলা করেছে—তার সুখ এইখানে? তার উপর একটা হৃদয়হীন লম্পট বাদসার মুখের প্রণয়-সম্ভাষণ—না, না ওস্‌মান আমার দেহ মন প্রাণ বিষে বিষে জর্জ্জরিত হয়েছে। এখানে হয় আমার মৃত্যু নয় এখান থেকে আমার মুক্তি চাই-ই চাই।"

আনন্দের আলোকে ওস্‌মানের চোখ দুটো উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল—ওস্‌মান অতি সন্তর্পণে অতি যত্নে যেন তা'তে হৃদয়ের

সমস্তখানি সোহাগ ঢেলে দিয়ে রুবেয়ার একখানি হাত আপন হাতে তুলে' নিলে—বল্‌লে—"রুবেয়া——"

কাল-সর্পের প্রলয়-নিশ্বাসের মতো একটা নিশ্বাস সমস্ত কক্ষটাকে যেন একটা তড়িতের ধাক্কা দিয়ে সন্ত্রস্ত করে' তুল্‌ল। চকিতে দু'জনে তাকিয়ে দেখ্‌লে—দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে বাদসা স্বয়ং।

বাদসার বদ্ধমুষ্টি কোষবদ্ধ ছুরিকার বাঁটে—চোখ দুটীতে তাঁর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হিংস্র দৃষ্টি—বাদসার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ থর্ থর্ করে' কাঁপ্‌ছে—ক্রোধে সর্ব্ব মুখমণ্ডল তাঁর লাল হ'য়ে গেছে।

চকিতে ওস্‌মান উঠে দাঁড়াল—কোষবদ্ধ ছুরিকা কোষমুক্ত করে' বাদসার দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল—ঠোঁটের কোণে তার দারুণ ঘৃণার অবলেপ—চক্ষে তার স্থিত প্রতিজ্ঞের ঐকান্তিক দৃঢ়তা।

প্রাণপণ কষ্টে আপনাকে সংযত করে' কণ্ঠস্বরে যেন প্রলয় বিষ উদ্গারিত করে' বাদসা বল্‌লেন—"ওস্‌মান-আলি, জাহান্নামে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।"

ওস্‌মান স্থির কণ্ঠে বল্‌লে—"হুসেন তোগলক, আমি প্রস্তুত—তবে জাহান্নামে যাবার জন্যে নয়, সেখানে অন্যকে পাঠাবার পথ করে' দেবার জন্যে।"

—"তবে আত্মরক্ষা কর্ বেইমান।"

বাদসা ছুরিকা নিষ্কাশিত করে' ওস্‌মানকে আক্রমণ কর্‌লেন। চক্ষের পলকে ছুরিকা-যুদ্ধ-কুশল হুসেন সা তাঁর ছুরিকা আমূল

ওস্‌মানের বক্ষে বসিয়ে দিলেন—ওস্‌মান কক্ষতলে লুটিয়ে পড়্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু—কণ্ঠ দিয়ে তার একটি শব্দ উচ্চারিত হবার অবসর পেলে না!

ওস্‌মানের বক্ষ হ'তে ছুরিকা খসিয়ে নিয়ে বাদসা কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন—কক্ষ শূন্য। ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মতো শোণিতসিক্ত ছুরিকা হাতে বাদসা কক্ষ থেকে বেরুলেন। পিয়ারী যেন সেইখানে অপেক্ষা কর্‌ছিল—বাদসা বল্‌লেন—"বাঁদী, শয়তানী বেইমানী জুলেখা কোথায়?"

নিঃশব্দে পিয়ারী একটা কক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কর্‌লে বাদসা বেগে সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন—এক পদাঘাতে দ্বার উন্মুক্ত করে' কক্ষে প্রবেশ কর্‌লেন—প্রবেশ করেই তাঁর চমক্ লাগ্‌ল।

কে বল্‌লে আজ দিল-মহলে জীবন-মৃত্যুর খেলা চলেছে—কে বল্‌লে আজ সেখানে হিংসা-প্রতিহিংসার অভিনয় হচ্ছে—তবে এ রোসনাই কেন! এ উৎসব-সজ্জা কেন! এখানে কি প্রবেশ কর্‌বে ছুরিকা-হস্তে প্রতারিত প্রণয়-বঞ্চিত—না পারিজাত মালা হাতে আনন্দ-বিহ্বল প্রেমিক?

সহস্র আলোকে কক্ষ আলোকিত। বেলোয়ারী ঝাড়ের আতসী কাঁচে লক্ষ লক্ষ রশ্মি প্রতিফলিত হ'য়ে বহু লক্ষ হ'য়ে তা চারিদিকে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। রক্তের রঙের চুনি আসমানী রঙের নীলা কত রঙ-বেরঙের হীরে জহরত পান্না মোতি কক্ষময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—তা'তে আলো পড়ে' হাজার রঙের

হাজার রশ্মির তীর ছুট্‌ছে। যেন আলোর দেওয়ালী লেগেছে —আলোর হাসি আলোর গান আলোর নাচ—আলোর স্থর আলোর স্বপ্ন আলোর কল্পনা—আলোকে আলোকে চতুর্দ্দিক আলোময়।

সেই আলোর মাঝে যেন চতুর্দ্দিক আরো উজ্জ্বল করে' দণ্ডায়মানা জুলেখাবানু—সর্ব্বাঙ্গ একটা কাশ্মিরী শালে আবৃত— গর্ব্বোন্নত তার শির, তড়িৎ-শিখা তার দৃষ্টি।

মুহূর্ত্তে যেন বাদসা আত্মবিস্মৃত হলেন। সম্মুখে পরম রমণীয় পরম কমনীয় পরম কাম্য রমণী—চতুর্দ্দিকে হাজার আলোকের রোস্‌নাই—এ যে স্বর্গ সৃষ্টি করে' বসে' আছে। কিন্তু পরক্ষণে আপনাকে সংযত করে' বজ্র-কঠোর কণ্ঠে বল্‌লেন—"বেইমানী, মর্‌বার জন্যে প্রস্তুত হ'।"

কণ্ঠস্বরে সমস্ত সোহাগ ঢেলে দিয়ে যেন জীবনের সমস্ত আকাঙ্খা মিশিয়ে জুলেখা জিজ্ঞেস কর্‌ল—"ওস্‌মান কোথায়?"

—"জাহান্নামে—জাহান্নামে—এইবার তোর পালা।"

জুলেখার গর্ব্বোন্নত শির আরও উন্নত হ'ল—দৃপ্ত গ্রীবায় কি এক ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তীব্র-কণ্ঠে বল্‌লে—"বাদসা! ওস্‌মান আলির সঙ্গে জাহান্নামে বাস করা হুসেন তোগ্‌লকের সঙ্গে বেহেস্তে বাস করার চাইতে স্থখের।"

জুলেখার কথায় ক্ষিপ্ত শার্দ্দূল যেন আরও ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল— বজ্র-মুষ্টিতে ছুরিকা উত্তোলিত করে' দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করে' হুসেন সা বল্‌লেন—"তবে বেইমানী জাহান্নামেই যা।"

জুলেখার শরীর থেকে কাশ্মিরী শাল খসে' পড়্‌ল—সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত দেহে আপনার দুই বক্ষের মাঝখানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' বল্‌লে—"হুসেন সা, তোমার ছুরি এইখানে পড়ুক—এইখানে যেখানে জীবনে আমি প্রথম প্রণয়-চুম্বন পেয়েছি।"

বাদসার হাতের উত্তোলিত ছুরিকা আর নাম্‌ল না—যেন বাহুর মাংসপেশী সমূহ কাজ কর্‌তে অস্বীকার কর্‌ল—বাদসার দুই চক্ষু নিবদ্ধ হ'ল সেই অসংখ্য দীপাবলী আলোকিত কক্ষে পরিপূর্ণ-যৌবনা বস্ত্র-লেশ-শূন্যা মহিমাময়ী রমণীর প্রতি—বাদসা যেন মন্ত্রমুগ্ধ।

বাদসার সমস্ত শরীর থর্ থর্ থর্ থর্ করে' কাঁপতে লাগ্‌ল—বজ্রমুষ্টি শিথিল হ'য়ে গেল—ছুরিকা হস্তচ্যুত হ'য়ে খসে' পড়্‌ল—হুসেন সা সেইখানে জুলেখাবানুর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়্‌লেন—অশ্রুরুদ্ধ স্বরে যেন জীবন-ভিক্ষার মিনতি কণ্ঠে নিয়ে বল্‌লেন—"জুলেখা—জুলেখা—হৃদয় তোমার যাকে খুসী তাকে দাও—কিন্তু আমাকে আমাকে—"। বাদসার অর্দ্ধ-রুদ্ধ স্বর রুদ্ধ হ'য়ে গেল, আর কোন কথা ফুট্‌ল না।

সহস্র দীপালোক যেন ধীরে ধীরে ম্লান হ'য়ে উঠ্‌ল—জুলেখার গর্ব্বদৃপ্ত শির ধীরে ধীরে কাঁধের উপর নুয়ে পড়্‌ল—লুণ্ঠিত বাদসার প্রতি চেয়ে যেন তার চোখ দুটো গভীর একটা বিষাদে ভরে' উঠল·········

····· যেন বুঝলে পশু পশুকে জয় করেছে।

রক্তদ্বীপ

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটী দ্বীপ। সেই দ্বীপে ব্রহ্মার সৃষ্টির কারখানা থেকে দু'খানি চিঠি এসে' পড়েছিল লক্ষ বছর পূর্ব্বে।

একখানি চিঠির রঙ্ ছিল রক্তের মতো লাল, আর-একখানির আকাশের মতো নীল।

রক্তের মতো লাল চিঠিখানির গায় জড়ান' ছিল দীপকরাগ, আর অগ্নি-শিখার কারুকার্য্যের মাঝে ছিল লেখা চিঠির জবান। সে রক্তের মতো লাল চিঠির জবান ছিল এই—

> মর্ত্ত্য-মানব! তোমার বক্ষ-পুরে যে প্রাণ-শক্তির ভাণ্ডার রক্ষিত আছে সে প্রাণ-শক্তি দুরন্ত তুরঙ্গমের চাইতেও চঞ্চল, প্রমত্ত ঝটিকার চাইতেও গতিশীল, দিগন্ত-প্রসারী সূর্য্যরশ্মির চাইতেও দূরগামী। এই ভাণ্ডারে বিপুল তার আত্ম-গোপন করে' আছে।

আকাশের মতো নীল চিঠিটার গায় জড়ান' ছিল শুভ্র উষার প্রফুল্ল স্নিগ্ধতা—আর নীলোৎপলে গাঁথা মাল্যরাশির নীচে সূক্ষ্ম হাতে লেখা ছিল—

> চরম রিক্ততার মাঝে একটি গোপন রহস্য রক্ষিত আছে যার স্পর্শ অকল্যাণকে মিথ্যা করবে—বিপুলকে হাল্‌কা করবে—সঞ্চয়রাশিকে মুক্তি দেবে।

দ্বীপের মানুষেরা লাল চিঠিটা পড়েই বল্‌লে—এ চিঠিতে যা লেখা আছে সে হচ্ছে মন্ত্র, অপৌরষেয়, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মতো সত্য, নব বর্ষার বারিধারার মতো সৃষ্টিক্ষম।

আর নীল চিঠিটা নিয়ে তারা সপ্তাহ ধরে' গবেষণা করলে অবশেষে ঠিক্‌ করল, যে সেটা হচ্ছে একটা অর্থহীন হেঁয়ালি, পাগলের প্রলাপবাক্য।

দ্বীপের মানুষেরা লাল পাথরের একটি বিপুল গগন-চুম্বি মন্দির তৈরী করে' তার মধ্যে সেই লাল চিঠিটাকে বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করল। আর পুষ্প-পল্লবে ধূপ-ধূনায় চন্দনে-কুঙ্কুমে তা'র সকালে পূজো ও সন্ধ্যায় আরতির বন্দোবস্ত করল।

নরনারীর উৎসবে, কাঁশি-বাঁশীর রাগ-রাগিনীতে, পুষ্প-চন্দনের গৌরবে, ধূপ-ধূনার সৌরভে, লাল চিঠির পূজো ও আরতি চল্‌তে লাগ্‌ল।

নীল চিঠিটা যে সবার অলক্ষ্যে বাতাসে কোথায় উড়ে' গেল তা কা'রও খেয়ালেই এল না।

২

লাল চিঠির পূজো চল্‌তে লাগ্‌ল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে দ্বীপের মানুষদের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা দিতে লাগ্‌ল। তাদের এতদিনকার শান্তিময় জীবন কোন্‌ যেন একটা অনা-গতের অপেক্ষার অস্বস্তিতে ভরে' উঠ্‌তে লাগ্‌ল। থেকে থেকেই তাদের বুকে-বুকে কাঁপন লাগে, শিরা-উপশিরা ফুলে ওঠে, অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গের পেশীগুলো স্ফীত হ'য়ে ওঠে—তাদের এতদিনকার একটানা জীবনযাত্রা একটা অর্থহীন বিরাট শূন্যের মতো মনে লাগে। দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আকাশে বাতাসে একটা অদ্ভুত বিদ্যুৎ তরঙ্গের খেলা সুরু হ'য়ে গেল। দ্বীপের মানুষেরা সেই বিদ্যুৎ তরঙ্গের মধ্যে দেখলে যে আরাম করবার মতো দুঃখ আর কিছুতে নেই।

এক শতাব্দীর মধ্যে দ্বীপের চেহারা একেবারে বদলে গেল। দ্বীপের মানুষদের চেহারা বদলে গেল। তাদের কাঞ্চননিভ বর্ণ, উন্নত দেহ, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, বিদ্যুৎ-পূর্ণ দৃষ্টি, অশান্ত হৃদয়, অদম্য আকাঙ্ক্ষা দেখে কে বলবে যে এরা সেই শতাব্দী আগের ছোট্ট দ্বীপের ছোট ছোট মানুষদের বংশধর যাদের বাসস্থান ছিল পাতার কুঁড়ে, অভাব ছিল দুটী অন্নের আর এক-খানি বস্ত্রের—যাদের সুখ ছিল সন্ধ্যা প্রদীপের আলোর ধারায় সমাপ্ত, যাদের দুঃখ ছিল উষার আগের আঁধারের মতো ক্ষণস্থায়ী। ঐ যে লাল পাথরে তৈরী মন্দিরের মাঝের মন্ত্র, সেই মন্ত্রগুণে অলসকে চঞ্চল করেছে, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করেছে, দীনকে দানবের মতো করেছে।—আজ ওরা অশান্ত সিন্ধুর দুর্দ্দান্ত তরঙ্গরাশিকে দলিত মথিত করে' শাসন করতে চায়, আকাশের উজ্জ্বল তারকা-রাজি ছিনিয়ে নিয়ে আপনাদের বিজয়মাল্য গাঁথতে চায়, চাঁদ থেকে চাঁদি কেড়ে নিয়ে আপনাদের মাথার কিরীট গড়তে চায়—আজ ওরা বাতাসের আগে ছুটতে চায়, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র তন্ন তন্ন করে' ঢুঁড়তে চায়—সব কেবল সেই একখানি রক্তের মতো

লাল চিঠির মন্ত্রগুণে যা'তে অগ্নিশিখার কারুকার্য্যের মাঝে এই কথা লেখা ছিল যে তাদের বক্ষ-পুরে যে প্রাণ-শক্তির ভাণ্ডার রক্ষিত আছে সেই ভাণ্ডারে বিপুল তার আত্মগোপন করে' আছে।

দ্বীপ জুড়ে' সমুদ্রের কূলে কূলে পাহাড়ের কোলে কোলে বিপুল নগর নগরী গড়ে' উঠল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধমালা বুকে করে'—এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধঘেরা নগর নগরীতে দিনরাতের পার্থক্য প্রায় ঘুচে' গেল। সারা দিনমানে কর্ম্ম কোলাহল, চারিদিকে কেবল ব্যস্ততা কেবল ব্যগ্রতা যেন এক মুহূর্ত্ত সময়কে আপনার মুঠির মধ্যে ধরে' তার অবসরে একশ' গুণ কাজ করে' নিতে চায়। তারপর সন্ধ্যা-সুন্দরীর দেহের কালো ছায়া সাগর জলে না পড়তে পড়তে পাহাড়ের বুকে না লাগতে লাগতে এই সব নগর নগরীতে লক্ষ লক্ষ আলোর ফোয়ারা জ্বলে ওঠে—কেউ বুঝতে পারে না দিনই বা কখন গেল আর রাতই বা কখন এলো। তারপর কর্ম্ম কোলাহল থেমে যায়, উৎসব-উল্লাস জেগে ওঠে। নরনারী বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে কর্ম্ম-কোলাহল-মুখরিত দিবসের সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছে ফেলে' হাস্যমুখে লঘু-গতিতে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে—উদ্যানে, রঙ্গালয়ে, নৃত্যশালায় —কত কত উৎসব মণ্ডপে। কামিনীদের কুন্তল হ'তে ধূপ-ধোঁয়ার সুরভি উড়তে থাকে পুরুষদের বক্ষের রক্তধারা নাচিয়ে নাচিয়ে—তাদের আঁখিতারার দৃষ্টি হ'তে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চারিদিকে চারিয়ে যেতে থাকে পুরুষ-বুকের প্রাণের তন্ত্রীতে উন্মাদনা জাগিয়ে জাগিয়ে। হাস্যে নৃত্যে সঙ্গীতে সুরায় রজনীর আঁধার-

হৃদয় রঙীন হ'য়ে ওঠে, মুখরিত হ'য়ে ওঠে, উল্লসিত হ'য়ে ওঠে। যেন এই দ্বীপবাসীদের কর্ম্মশক্তিরও ইয়ত্তা নেই—ভোগসামর্থ্যেরও সমাপ্তি নেই। আর এ সবই কেবল সেই একখানি রক্তের মতো লাল চিঠির মন্ত্রগুণে, যা'তে অগ্নিশিখার কারুকার্য্যের মাঝে এই কথা লেখা ছিল যে মানুষের বক্ষ-পুরে যে প্রাণ-শক্তির ভাণ্ডার রক্ষিত আছে সেই ভাণ্ডারে বিপুল তার আত্মগোপন করে' আছে।

ধরিত্রী কত স্থানে আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে' কত কত ধন-রত্ন দান কর্‌ল—অনুর্ব্বর কত স্থান উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হ'য়ে গেল—পাহাড়ের বুক থেকে সাগরের কূল পর্য্যন্ত হরিৎ শস্যের চোখ-জুড়ান' দৃশ্যপট ইন্দ্রজালের মত খুলে' গেল। কত কত জ্ঞান বিজ্ঞানের গোপন রহস্যের আবিষ্কারে সারা দ্বীপ যেন একটা যাদুবিদ্যার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হ'য়ে গেল। কোথায় একটু ধাতব খণ্ড টেনে দিলে নিমেষে সূর্য্যের মত আলো হ'য়ে ওঠে, কোথায় কেবল একটী তার স্পর্শ করে' যোজন দূর থেকে একজন আর-একজনের সঙ্গে কথা কয়—বাহনহীন যান সব ঝড়ের মত ছুটে চলে। কোথা থেকে এরা যেন কোন্ যাদুমন্ত্র লাভ করেছে। এ যাদুমন্ত্র দেবতার না দৈত্যের কে জানে! আর সব সেই লাল চিঠির মন্ত্রগুণে, লাল পাথরের মন্দিরে বিগ্রহরূপে স্থাপিত করে' যার তারা প্রতিদিন পূজো ও আরতি করে। ঘণ্টা বাজে, কাঁশর বাজে, ধূপ-ধুনা গন্ধ ছড়ায়, পুষ্প-চন্দন বেদীমূল আচ্ছন্ন করে' ফেলে—আর মানুষদের বুকে বুকে কোন্ অশান্ত অসুর জেগে ওঠে।

এম্‌নি করে' দিন যায়, বর্ষ যায়, শতাব্দী যায়; দেশ ধন ধান্যে ভরে' গেল, ঐশ্বর্য্য সম্পদে পূর্ণ হ'য়ে গেল—নানা শিল্প বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠ্‌ল—দ্বীপের একটি ধূলিকণা পর্য্যন্ত কারো অপরিচিত রইল না—কিন্তু তবুও বুকের অশান্ত অসুর তেম্‌নি অশান্ত র'য়ে গেল। দৈনন্দিন সাম্বাৎসরিক বাঁধা কর্ম্মের মধ্যে ভোগের মধ্যে সবাই হাঁপিয়ে উঠ্‌ল—সবাই কেবল বলাবলি কর্‌তে লাগল—অতঃ কিম্‌?—অতঃ কিম্‌?—অতঃ কিম্‌?—এর পর কি? এ অশান্ত অসুরকে কোন্‌ মন্ত্রে শান্ত কর্‌ব? কোন্‌ কর্ম্মে তৃপ্ত কর্‌ব?—সারা দেশের বুক অপরিমিত ধন-ধান্যের মধ্যে অজস্র ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মাঝে দুঃখের প্রকাণ্ড পাহাড়ে ভারাক্রান্ত হ'য়ে গেল—কর্ম্ম রসহীন—ভোগ অর্থশূন্য—জীবন বিস্বাদ।

তখন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দূর-দৃষ্টি-প্রসারী কাচ-নির্ম্মিত এক যন্ত্র সমুদ্রের উপকূলে পঞ্চদশ তলের এক মঞ্চের সর্ব্বোচ্চ তলে নিয়ে গিয়ে স্থাপন কর্‌লেন। দ্বীপবাসীদের ডেকে বল্‌লেন—"এই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে সমুদ্রের দূর দিকচক্রবালে দৃষ্টি ফেল।" দ্বীপ-বাসীরা তাই কর্‌ল।

পুরোহিত জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"কি দেখছ?"

প্রধান দ্বীপবাসী বল্‌লেন—"দেখ্‌ছি নীল সিন্ধুর অশান্ত হৃদয় —উত্তাল তরঙ্গমালা—তারি মাথায় শুভ্র ফেন-পুঞ্জ-পুঞ্জ—আর দূর দূর অতি দূরে ঐ তরঙ্গমালা-সঙ্কুল সিন্ধুর নীল বক্ষ থেকে জেগে উঠেছে একটী গাঢ় সবুজ রেখা।"

পুরোহিত বল্‌লেন—"ঐ সবুজ রেখা হচ্ছে আর একটী দেশ। এই দেশ জয় কর্‌তে হবে। আমাদের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য সম্পদ লাভ হয়েছে, কিন্তু কোন গৌরব লাভ হয় নি। ঐ দেশ জয় কর্‌তে হবে। দেশ-জয়ে গৌরব আছে।"

চারিদিক থেকে রব উঠ্‌ল—"হাঁ হাঁ, আমাদের গৌরব চাই—আমরা ওই দেশ জয় করে' গৌরব অর্জ্জন কর্‌ব—গৌরবহীন জীবন সে মৃত্যুর সমান—গৌরবহীন জীবন সে সূর্য্যহীন দিবস, আনন্দহীন প্রেম—ওই দেশ জয় কর্‌ব—সিন্ধু-তরঙ্গ দলিত মথিত করে' আমরা যাত্রা কর্‌ব—কৃপাণের আগে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কর্‌ব—নালিকাস্ত্রে সমস্ত ধ্বংস কর্‌ব।" সমস্ত দ্বীপবাসীর বক্ষের শোণিত সমুদ্র তরঙ্গের মতোই নেচে উঠ্‌ল! মন্দিরে ঘণ্টা বাজল, কাঁশর বাজল, ধূপের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশ বাতাস সমাচ্ছন্ন করে' ফেল্‌ল—দ্বীপবাসীদের কণ্ঠ চিরে' এক বিরাট হুঙ্কার উঠ্‌ল—"জয় জয় জয়—রক্তদ্বীপের জয়।"

রক্তদ্বীপ জুড়ে' সাজ সাজ রব পড়ে' গেল। তূরী ভেরী বেজে উঠ্‌ল, শঙ্খ শিঙ্গা হুঙ্কার করে' উঠ্‌ল—রক্তদ্বীপের লোহিত পতাকা পত্‌ পত্‌ করে' উড়্‌তে লাগ্‌ল। জীবনের আবার একটা নূতন অর্থের আবিষ্কার হয়েছে—সমাপ্তির ভিতর থেকে একটা নূতন আরম্ভের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর দুঃখ কি, অসোয়াস্তি কোথায়, অশান্তি কোথায়!—এই যে শিরায় শিরায় শোণিত আবার টগ্‌ বগ্‌ করে' ফুট্‌ছে, বুকে বুকে আনন্দ-কম্পন লাগ্‌ছে, দিকে দিকে বসন্তের সুর উঠেছে, যৌবনের গান ফুটেছে, নব

যাত্রার নবীন ছন্দ তাল দিচ্ছে। বল একবার জয় জয় জয়, রক্ত-দ্বীপের জয়!

তারপর সপ্তশত অর্ণবযান অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী রক্তদ্বীপের বন্দর ত্যাগ কর্‌ল—সেই দূরদেশের অভিমুখে। প্রশান্ত মহাসাগর অশান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

সে দেশের মানুষেরা একদিন আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখ্‌ল, তাদের উপকূলে সপ্তশত অর্ণবযান আর তা'তে অসংখ্য মানুষ যোদ্ধৃবেশে!

তারা জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ? তোমাদের উদ্দেশ্য কি?"

রক্তদ্বীপের সেনাপতি উত্তর কর্‌লেন—"আস্‌ছি আমরা রক্তদ্বীপ থেকে। এ দেশের নাম কি?"

"রত্নদ্বীপ—।"

"আমাদের উদ্দেশ্য এই রত্নদ্বীপ জয় করা।"

রত্নদ্বীপের মানুষেরা আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—"সে কি! কেন?"

সেনাপতি উত্তর কর্‌লেন—"আমাদের দেশ আর আমাদের আঁট্‌ছে না।"

রত্নদ্বীপ বল্‌লে—"এত লোক সংখ্যা তোমাদের দেশে?"

সেনাপতি বল্‌লেন—"লোক সংখ্যার কথা নয়। আসলে আমাদের প্রাণশক্তি আমাদের দেশ ছাপিয়ে গেল—কর্ম্ম ছাপিয়ে গেল—ভোগ ছাপিয়ে গেল। এতদিন তাকে ভৌতিক সুখ জুগিয়েছি, আর তা'তে চল্‌ছে না—আজ তার মানস-জগতের

সুখ চাই, আজ তাই আমাদের গৌরব চাই, যশ চাই—জগত জুড়ে' আমাদের মান প্রতিপত্তি চাই।"

রত্নদ্বীপের মানুষেরা বল্‌লে—"ভৌতিক সুখে আর তোমাদের আস্থা নেই—মানস-জগতের সুখই যে শেষ পর্য্যন্ত সুখ দেবে, তা' কে বল্‌লে? প্রাণ-শক্তি যে ওইখানেই আপনার শেষ সার্থকতা পাবে, তা' কে বল্‌লে?"

রক্তদ্বীপের সৈন্যেরা বলে' উঠ্‌ল—"পাবে পাবে—দেখ্‌ছ না আমাদের শিরায় শিরায় শোণিত কি চন্‌ চন্‌ কর্‌ছে, বুকে বুকে কি কম্পন লাগ্‌ছে, বাহুতে বাহুতে কি শক্তির আবির্ভাব হয়েছে। এ শক্তির কি সমাপ্তি আছে? এ উল্লাসের কি শেষ আছে? এ আনন্দের কি মৃত্যু আছে? নেই—নেই—নেই।—দেশ-জয়ের গৌরব কোন দিনই খিন্ন হবে না।"

রত্নদ্বীপের মানুষ বল্‌লে—"ভুল ভুল—প্রকাণ্ড ভুল—মানস-জগৎ অসীম নয়, তার সীমা আছে। যশ, মান, গৌরব, দৈহিক সুখের মতোই একদিন সুখহীন অর্থহীন অতৃপ্তির হ'য়ে উঠ্‌বে। প্রাণ-শক্তি ঐখানেই বাকি থাক্‌বে না। ওর যাত্রাপথ ওইখানেই শেষ নয়। এই একটা প্রকাণ্ড ভুলের জন্য মানুষ হত্যা কর্‌বে? মানুষ মানুষকে হত্যা কর্‌বে?"

রক্তদ্বীপের সেনাপতি মৃদু হাস্য কর্‌লেন, বল্‌লেন—"দেশ-জয়ের গৌরবই আমাদের কাম্য—জীবন-রক্ষার নৈতিক তত্ত্ববিচার নয়।"

তখন রত্নদ্বীপ উত্তর কর্‌লে—"দেশ-জয়ের গৌরবই যদি তোমাদের একান্ত কাম্য, তবে তাই হোক্‌।"

তারপর একটা বিরাট শৃঙ্গধ্বনি করে' উঠ্‌ল। সেই শৃঙ্গের ধ্বনি রত্নদ্বীপের নগর থেকে নগরে, পল্লী থেকে পল্লীতে, পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে, নদ নদীর কূলে কূলে, উপত্যকা অধিত্যকায়, প্রান্তরে কান্তারে প্রতিধ্বনি করে' উঠ্‌ল। শান্তি সমাহিত দেশ দুলে উঠ্‌ল, টলে উঠ্‌ল। নিদ্রিত দানব যেন জেগে উঠ্‌ল। ঘুমন্ত অজগর যেন আপনার ক্রুদ্ধ রক্তচক্ষু মেলে দিল। রত্নদ্বীপ প্রকাণ্ড দেশ, কোটি কোটি নরনারীর বাস। সপ্তাহ না যেতে যেতে কাতারে কাতারে রত্নদ্বীপের সেনা সজ্জিত হ'ল। বিরাট হুঙ্কার উঠ্‌ল—জয় রত্নদ্বীপের জয়।

তারপর রক্তদ্বীপে আর রত্নদ্বীপে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল।

তুমুল সংগ্রাম—সৈন্যদের জয়নাদে আহতের আর্ত্তনাদে শঙ্খ শিঙ্গার হুঙ্কারে মিলে একটা বিভীষণ ধ্বনিতে জল স্থল বিমান প্রকম্পিত হ'তে লাগ্‌ল—কত সৈন্য হত হ'ল কত সৈন্য আহত হ'ল তার সংখ্যা কে করে? সমুদ্রের তরঙ্গের মতো বাহিনীর পর বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে—যেন পরস্পর পরস্পারকে মত্ত শার্দ্দূলের মতো ছিঁড়ে ফেল্‌বে ক্ষুধিত শ্যেনপক্ষীর মতো টুক্‌রো টুক্‌রো করে' আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি কর্‌বে।

সময় মতো রক্তদ্বীপে সংবাদ গেল যে রক্তদ্বীপের সৈন্য বাহিনীর অর্দ্ধেক হত আর অর্দ্ধেক আহত—নতুন সৈন্য চাই।

আহত সৈন্যেরা রক্তদ্বীপে ফিরে' গেল—আবার সপ্তশত অর্ণবযানে নতুন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী রত্নদ্বীপে উপস্থিত হ'ল।

এম্‌নি করে' যুদ্ধ চল্‌তে লাগল। বাহিনীর পর বাহিনী রক্তদ্বীপ থেকে রত্নদ্বীপে পৌঁছল। তার কত হত হ'ল কত আহত হ'ল। কিন্তু রত্নদ্বীপের সৈন্যবাহিনী যেন অফুরন্ত, অদম্য, অজেয়। পঞ্চ-বর্ষ যুদ্ধের পর রক্তদ্বীপ থেকে সংবাদ এলো—রক্তদ্বীপে বাল-বৃদ্ধ-বণিতা ও বিকলাঙ্গ ছাড়া আর মানুষ নেই। নতুন সৈন্য বাহিনী আর গড়া চল্‌বে না। সংবাদ পেয়েই রক্তদ্বীপের সেনাপতি তাঁর সঙ্গের অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে রক্তদ্বীপে ফিরে চল্‌লেন। রত্নদ্বীপের বিশাল সৈন্য বাহিনীর মধ্য থেকে রুদ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—জয় রত্নদ্বীপের জয়।

৩

সেনাপতি রক্তদ্বীপে পৌঁছলেন। দেখ্‌লেন দেশের আকাশে বাতাসে আর সে আনন্দের সুরের হিল্লোল নেই—চারিদিক যেন একটা কিসের কালিমায় ব্যথিত হ'য়ে উঠেছে। নগর নগরীতে আর সারা দিনমানে সে ব্যগ্রতা সে ব্যস্ততা নেই—রাস্তায় রাস্তায় চোখে পড়ে কত কত বিকলাঙ্গ, কারো এক পা নেই, কারো এক হাত নেই, কারো চক্ষু অন্ধ, কারো একটা কান কোথায় অদৃশ্য হয়েছে—এরাই ধীর মন্থর গতিতে চলেছে, যেন সময়ের কোন মূল্য নেই, জীবনেরও কোন উদ্দেশ্য নেই। সারা রজনীভরা আর সে উৎসব-আনন্দ নেই—সন্ধ্যা না লাগ্‌তে লাগ্‌তে চারিদিক সব নিস্তব্ধ নিঝুম হ'য়ে ওঠে—বিপণি রাস্তা সব লোকবিরল হ'য়ে আসে—রঙ্গালয় নৃত্যশালা আর কেউ খোলে না—উদ্যানে উদ্যানে আর কেউ বিচরণ করে না—কোন্ দেবতার যেন এক

দুরন্ত অভিশাপ দেশের মর্ম্মস্থল বজ্র বন্ধনীতে ধরে' আছে—কান পাত্‌লে যেন শোনা যায় সমস্ত আকাশ বাতাস জুড়ে' একটা মৌন করুণ ক্রন্দন গুম্‌রে গুম্‌রে আপনাকে ক্লান্ত করছে।

সেনাপতি লাল পাথরের মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হলেন—প্রধান পুরোহিতকে লক্ষ্য করে' ব্যথিত-কণ্ঠে বল্‌লেন—"প্রভু রক্ত-পাথরের মন্দিরে এ কোন্ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে' আমরা পূজো কর্‌ছি? মানব-জীবনের এই কি শেষ পরিণতি? অন্ধ ধ্বংসের পথই কি তা'র শেষ আশ্রয়?"

প্রধান পুরোহিত উত্তর কর্‌লেন—"অসম্ভব—এই অন্ধ ধ্বংসই মানব জীবনের শেষ আশীর্ব্বাদ হ'তে পারে না—আমি এই কথাই গত চার বছর থেকে ভাব্‌ছি—ভাব্‌ছি কোথায় যেন একটা কি ভ্রান্তি আছে।"

তারপর ক্ষণকাল মৌন থেকে তিনি ধীরে ধীরে যেন আপন মনে বল্‌লেন—"পুরাণে দেখ্‌ছি সৃষ্টির আদিতে দু'খানা চিঠি দেশের বুকে এসে পড়েছিল, একখানি লাল আর-একখানি নীল—লাল চিঠিটারই আমরা পূজো কর্‌ছি কিন্তু নীল চিঠিটা কোথায় গেল তা কেউ জানে না—হয় ত সেই চিঠিটায় একটা [illegible] মন্ত্র ছিল।"

তখন দেশ জুড়ে' নীল চিঠির খোঁজ পড়ে' গেল। কিন্তু সে-চিঠি আর কোথাও পাওয়া গেল না।

অবশেষে মন্দিরের ফুল জোগায় যে মালী একদিন প্রধান পুরোহিতের কাছে এসে বল্‌লে—"মহাপ্রভু, আমি স্বপ্নে নীল

চিঠির সন্ধান পেয়েছি—সে চিঠি রক্তমন্দিরের লাল চিঠির সিংহাসনতলে গুপ্ত আছে।"

লাল চিঠির সিংহাসনতলে সেই নীল চিঠি পাওয়া গেল। তেম্‌নি উজ্জ্বল—তার গায় জড়ান' শুভ্র ঊষার প্রফুল্ল স্নিগ্ধতা—আর নীলোৎপলে গাঁথা মাল্যরাশির নীচে সূক্ষ্ম হাতে লেখা—

> চরম রিক্ততার মাঝে একটি গোপন রহস্য রক্ষিত আছে যার স্পর্শ অকল্যাণকে মিথ্যা কর্‌বে—বিপুলকে হাল্‌কা কর্‌বে—সঞ্চয়রাশিকে মুক্তি দেবে।

রক্তদ্বীপের মানুষেরা জিজ্ঞেস কর্‌ল—"এর অর্থ কি? কি এর তাৎপর্য্য?"

প্রধান পুরোহিত বল্‌লেন—"আমি জানি না।"

কিছুক্ষণ মৌন থেকে তারপর সহসা বলে' উঠ্‌লেন—"আমি হিরণ্ময় পর্ব্বতের গুহায় তপস্যা কর্‌তে চল্‌লুম। আমি না ফেরা পর্য্যন্ত লাল চিঠির পূজো ও আরতি বন্ধ থাকুক।"

প্রধান পুরোহিত তপস্যা কর্‌তে চলে' গেলেন।

দশবর্ষ কঠোর তপস্যার পর প্রধান পুরোহিত লাল মন্দিরে ফির্‌লেন—দেশের লোক ঝুঁকে এলো লাল মন্দিরের দ্বারে—জিজ্ঞেস্ কর্‌ল—"প্রভু, কি তাৎপর্য্য নীল চিঠির?"

পুরোহিত উত্তর কর্‌লেন—"লাল চিঠিটার কি তাৎপর্য্য তা কি কেউ কোনদিন জিজ্ঞেস করেছিলে?"

দেশের লোক বল্‌লে—"লাল চিঠির তাৎপর্য্যের জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কোথায়? ওর তাৎপর্য্য ত স্পষ্ট, তা আছে আমাদের বুকে বুকে।"

পুরোহিত বল্‌লেন—"এই নীল চিঠিটার তাৎপর্য্যও আছে এই বুকে বুকে, ব্যাখ্যায় সে তাৎপর্য্য কিছুতেই বোধগম্য হবে না, যতদিন এ জিজ্ঞাসার বস্তু থাকবে ততদিন এর রহস্যোদ্ঘাটন হয় নি বুঝ্‌তে হবে। তবে এই নীল চিঠির তাৎপর্য্য লাল চিঠির তাৎপর্য্যের মতোই একদিন বুকে বুকে জেগে উঠ্‌তে বাধ্য।"

দেশের লোক বল্‌লে—"ইতিমধ্যে?"

—"ইতিমধ্যে শ্বেত পাথরের এক মন্দির নির্ম্মাণ করে' এই নীল চিঠিটাকে সেখানে বিগ্রহরূপে স্থাপিত করে' তার পূজো ও আরতি করতে হবে।"

দেশের লোক বল্‌লে—"আর লাল চিঠির মন্দিরের ধ্বংস করতে হবে?"

পুরোহিত একটু মৃদু হাস্য করে' বল্‌লেন—"না। এই নীল চিঠির শ্বেত-মন্দিরকে লাল চিঠির রক্ত-মন্দিরের পাশেই গড়ে' তুল্‌তে হবে—লাল চিঠি নীল চিঠি দুই-ই বিধাতার হস্তাক্ষর। এ দুয়েরই পূজো করতে হবে। এই দুয়ের মিলনেই কল্যাণ।"

লাল পাথরের মন্দিরের পাশে শ্বেত পাথরের এক বিরাট মন্দির তৈরী হ'ল। সেইখানে নীল চিঠিটাকে বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করা হ'ল।

তারপর আবার লাল মন্দিরের রক্তচূড়া থেকে রক্তপতাকা পত্‌পত করে' উড়্‌ল—ঘণ্টা বাজল কাঁশর বাজ্‌ল—পুষ্প-চন্দনের গন্ধে চারিদিক ছেয়ে গেল, ধূপের ধোঁয়ায় চারিদিক অস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল—আবার লাল চিঠির উষায় পূজো সন্ধ্যায় আরতি আরব্ধ হ'য়ে গেল।

আর শ্বেত-মন্দিরে পুরোহিত-কণ্ঠে দিবানিশি অবিরাম মন্ত্রোচ্চারিত হতে লাগ্‌ল—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়—

রামেশ্বর এণ্ড কোং, চন্দননগর

— প্রচারিত —

নব যুগ-সাহিত্য

ধর্ম্ম ও জাতীয়তা পাঁচ সিকা

শ্রীঅরবিন্দ

সত্যকার ধর্ম্ম কাহাকে বলি, গীতায় উপনিষদে ধর্ম্মের স্বরূপ কি দেখান হইয়াছে, নূতন যুগে নূতন কোন্ ধর্ম্মকে ধরিয়া মানুষ মানুষ হইয়া উঠিবে—আর সত্যকার জাতীয়তা কি, ভারতের বৈশিষ্ট্য কোথায়, ভবিষ্যতের মানব-সমাজে ভারতের স্থান কোথায় এই সকল বিষয়ের অতি সরল সুন্দর শিক্ষাপ্রদ ব্যাখ্যা বইখানির মধ্যে রহিয়াছে।

পূর্ণযোগ বারো আনা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দের যোগের মূলতত্ত্ব কয়টি দেখান হইয়াছে। প্রাচীন ও প্রচলিত সাধনপন্থাগুলির—যেমন হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির—সার্থকতা কি, আর অভাবই বা কি, সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সহায়ে একটা পূর্ণতর সাধনার সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে বিজ্ঞান বা অতি মানসের সাধনা সম্বন্ধে একটি নূতন অধ্যায় যোগ করা হইয়াছে।

"গ্রন্থকারের আদর্শ অতি উচ্চ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনের অনুগত। এই পুস্তিকার প্রচার বাঞ্ছনীয়।"—প্রবাসী

"ভাষা অতি সহজ, সরস, দীপ্তিময়ী; গ্রন্থকারের আপনার শক্তির উপর আস্থা, লেখার অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

দেবজন্ম — এক টাকা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

মানুষ যেদিন হইতে মানুষ সেদিন হইতে সে দেবত্বের স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। যুগের যুগের এই স্বপ্ন আজ কি সফল হইতে চলিয়াছে? —অন্ততঃ কোন্ পথে চলিলে মানুষের এই মহাসিদ্ধি সম্ভব কয়েকটি দিক হইতে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে।

"ইহার কোথাও 'বাঁধি' বুলি নাই, একটি উদ্যমশীল সাধনশীল সবল আত্মার স্বাধীন চিন্তা ও প্রত্যক্ষীভূত সত্যের স্বাভাবিক প্রকাশ সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। প্রবন্ধগুলিতে যেমন চিন্তাশীলতা, শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহিতা সুব্যক্ত, তেমনি সাত্ত্বিকতা, দৃষ্টির প্রসারতা (Wide outlook) ও উদারতা সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট।"—সৌরভ

ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা — পাঁচ সিকা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ঋগ্বেদের গোড়াকার কতকগুলি সূক্তের টীকা, টিপ্পনী ও বাঙলা অনুবাদ। এই পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের দেওয়া বেদের ব্যাখ্যা অনুসৃত হইয়াছে। ৪৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ উপক্রমণিকা বেদপাঠের ভূমিকা স্বরূপ। এই অংশে অনুবাদক বেদ কি?—বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কি?—বেদ বুঝিবার উপায় কি?—বেদকে ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী কি চোখে দেখেন?—বেদ সম্বন্ধে এদেশীয়দের ধারণাই বা কি?—ইত্যাদি বিষয় নূতন দিক হইতে নূতন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বেদ হিন্দুধর্ম্মের মূল; ইহার সহিত পরিচিত হওয়া, ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা হিন্দুমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

"এই নূতন ভাষ্যের মধ্যে প্রভূত চিন্তাশীলতা ও নবভাবের আলোকসম্পাত দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের মধ্যে আর্য্য-সমাজের শ্রেষ্ঠ মনন ও কৃষ্টি নিহিত আছে। ব্যাখ্যাকারেরা সেই আর্য্য-সংস্কৃতি আবিষ্কার করিয়া নিজেদের মনীষা ও অনুসন্ধিৎসার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।"—প্রবাসী

স্বরাজের পথে
বারো আনা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

বর্ত্তমান যুগের বাণী কি?—বর্ত্তমানের সমস্যাই বা কি?—স্বরাজ কি?—কোন্ পথে মানবজাতি প্রকৃত স্বরাজ পাইবে? —যে-সমস্ত বিষয় লইয়া বর্ত্তমানে বহু আলোচনা ও বাদানুবাদ চলিয়াছে—সে-সম্বন্ধে গ্রন্থকার নানান্ দিক দিয়া আলোচনা করিয়া প্রকৃত স্বরাজ কি তাহারই ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

"সন্দর্ভগুলিতে পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার সঙ্গে স্বদেশ-প্রাণতার যে পরিচয় পাই তাহা উঁচু দরের। Practical সত্য লইয়াই তাঁর কারবার, বাজে জলুষ দিয়া ফলটাকে তিনি বকাণ্ড-প্রত্যাশার সামগ্রী গড়িয়া তোলেন না—এইটুকু তাঁর চিন্তার বিশেষত্ব।"—ভারতী

স্বাধীন মানুষ
পাঁচ সিকা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষকে ছোট করে', খর্ব্ব করে', পঙ্গু করে' সমাজ, রাষ্ট্র বা ধর্ম্ম কোনো দিনই বড় হয়নি—হবেও না। রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে—দেশে আজ স্বাধীন মানুষের একান্ত প্রয়োজন—এই কথাই উপেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন তাঁর অননুকরণীয় অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গীতে।

"প্রবন্ধ সাহিত্য যে এমন সুন্দর হইতে পারে, ভাষার শক্তি যে এমন প্রবল হইতে পারে—তাহা উপেন্দ্রনাথের লেখা না পড়িলে বুঝা যায় না।"—বাঙ্গলার কথা

পথের সন্ধান
পাঁচ সিকা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের মুক্তিপথ-যাত্রীরা আজ নানা মুনির নানা মতের মাঝে পড়ে' দিশেহারা। কোন্ পথ অনুসরণ করলে জাতি তার ধ্রুবলক্ষ্যে পৌঁছাবে —গ্রন্থকার বিবিধ মতের ও পথের আলোচনা দ্বারা সেই সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন।

সবুজ কথা

দেড় টাকা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাঙালী জাতির সভ্যতায় আজ যে নতুন যুগ এসেছে, গ্রন্থকার বিবিধ বিষয়ের মধ্য দিয়ে সেই কথাই অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন সংস্কার বিধি-নিষেধ, শিক্ষা, নারী সম্বন্ধে লেখক যে-সব কথা বলেছেন তা এ যুগের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষেরই প্রণিধান যোগ্য।

"যাঁরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সম্পর্কে স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়ায় সজীবতা ও স্বাস্থ্য অনুভব করিতে চান, যাঁরা চির সবুজ থাকিতে উৎসুক তাঁরা এই বই পড়িলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।"—প্রবাসী

"সন্দর্ভগুলি সমাজ ও সাহিত্যের নিপুণ আলোচনা। সেগুলি কবিত্বে মণ্ডিত, ভাবুকতায় রঞ্জিত। ভাষায় লেখক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছেন—বিচিত্র রঙে রঙীন ভাষা। তরুণ প্রাণের উৎসাহ পূর্ণ এই সন্দর্ভগুলি আশার রাগিণীতে ঝঙ্কৃত, প্রাণের স্পন্দনে লীলায়িত। চিন্তা ও তাহার প্রকাশের ধারায় লেখকের শক্তির পরিচয় পাই।"—ভারতী

লড়ায়ের নতুন কায়দা

বারো আনা

ভার্দ্দুন-প্রত্যাগত ফরাসী-স্বেচ্ছা-সৈনিক

শ্রীহারাধন বক্সী প্রণীত

বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ ব্যাপারটা কি আকার নিয়েছে কয়েকটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার তার চিত্র পাঠকের সামনে ধরেছেন। বইখানি লেখকের শিক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হতে লেখা—কোনো ব'য়ের অনুবাদ নয়। বাঙলা সাহিত্যে এ ধরণের বই আর নেই।

"হারাধন বক্সীর 'লড়ায়ের নতুন কায়দা' বইখানি যে বাঙালীর কাছে বাঙালী-যোদ্ধার বলবার অনেক নতুন জিনিষ নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে—সেটা কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়—কেননা লড়াই তাঁর বই-এ পড়া বিদ্যা নয়, চোখে দেখা হাতেহাতে রপ্ত করা বিদ্যা। তার ওপর হারাধনের ভাষার বাঁধুনী আছে—তাতে বইখানিকে আগাগোড়া সুখপাঠ্য করে' তুলেছে। আমার আশা নবীন বঙ্গ তার স্বরাজ-সাধনার উপকরণ হিসাবে এ বইখানি ঘরে ঘরে রাখবেন।"—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ঐন্দ্রজালিক **পাঁচ সিকা**

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গল্পগুলিতে লেখক মানব-জীবনের সেই গোপন রহস্য-কথা ঐন্দ্রজালিকেরই মতো অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"ভাব, ভাষা, দ্যুতি ও ব্যঞ্জনা আদ্যন্ত এক উজ্জ্বল অথচ গভীরতৃপ্তিদায়ক কিরণ বিচ্ছুরিত করছে।......স্থায়ী সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবে বলে' মনে হয়।" —সবুজপত্র

"লেখক নিজেই ঐন্দ্রজালিক। সোণার কলমের স্পর্শে তুচ্ছ বিষয়কেও কল্পনার কুহকে জড়াইয়া অপরূপ মোহন করিয়া তুলিয়াছেন।......যাঁহারা উচ্চ সাহিত্যের মধুর রসাস্বাদ করিতে চান, তাঁহাদিগকে এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।"—প্রবাসী

"যে-কোন সাহিত্যের পসরা ওজনে ভারী হয়ে উঠতে পারে।"—উত্তরা

কবিগুরু **রবীন্দ্রনাথের** আশীর্ব্বাদ

"সুরেশের যাত্রাপথে ফলবান তরুচ্ছায়া ও উচ্ছসিত
উৎসধারা দেখা দিয়েচে।"

নতুন রূপকথা **তেরো আনা**

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রূপকথার ভাষায় অতীত ভারতের ঐশ্বর্য্যময় আনন্দময় কল্পনা-চিত্র। গল্প বলার ধরণ এমনি সুন্দর, বর্ণনাগুলি এমনি চমৎকার যে পড়্তে পড়্তে মনে হয় যেন আমাদেরই চোখের সুমুখে সব ঘটে যাচ্ছে।

"রূপকথার রচনার ধরণ মিষ্ট, সরস, বেগবান, প্রাণবান। এর অন্তর্নিহিত সত্য, তাৎপর্য্য দেশের নরনারী হৃদয়ঙ্গম করিয়া জড়তামুক্ত, আত্মপ্রত্যয়ী ও দেশপ্রিয় হোন, আমাদের এই আন্তরিক কামনা ও অনুরোধ।"—প্রবাসী

"সুরেশচন্দ্র নতুন রূপকথায় যে মূল কথাটি বলতে চান তা যে এ যুগের বোধন-মন্ত্র—এ নবীন রাঙা উষার আগমন-গীতি।"—নারায়ণ

"রূপকথা পড়বার সময় আমার চোখের সুমুখে Tintoretto'র এক-একখানি ছবি ফুটে ওঠে।"—প্রমথ চৌধুরী

কমলাকান্ত   দেড় টাকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা অমর-গ্রন্থ কমলাকান্তের শোভন সংস্করণ। এই সংস্করণে প্রচলিত ও পূর্ব্ব প্রকাশিত সংস্করণ সমূহে প্রুফ-রিডারের যে-সব ভুল রহিয়া গিয়াছিল সেগুলি অতি যত্নের সহিত সংশোধিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সব দিক দিয়া বইখানিকে অতি সুন্দর ও শোভন করা হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষর সমন্বিত দুই রঙা চিত্র শোভিত।

"সুন্দর, সুরুচি সঙ্গত।"—প্রবাসী

"এমন সুন্দর ও সুষ্ঠু সংস্করণ দুর্লভ।"—বিজলী

কমলাকান্তের পত্র   ন' সিকা

নবীন-'কমলাকান্ত' বিরচিত

বাঙ্গালীর সমাজ, জীবন, ধর্ম্ম, সংস্কার—ইত্যাদি নানা বিষয়ে নক্সা। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কমলাকান্তে আরো নূতন ভাব-সম্পদ সংযোগ—নবযুগের অভিনব প্রশ্নসমূহের উপর নূতন আলোকপাত।

"সেকেলে কমলাকান্ত সাহস করিয়া যে-সব কথা বলিতে পারেন নাই, নবীন কমলাকান্ত এমন অনেক কথা অসঙ্কোচে বলিয়াছেন।"—আনন্দবাজার

"এই পুস্তক পাঠ করিলে নব নব বিষয়ে চিন্তা উদ্রিক্ত হয়, জ্ঞাত বিষয়ের উপর নূতন আলোকপাত হয়, বহু সমস্যা ও সমাধান মনের সম্মুখে উপনীত হয়।"—প্রবাসী

"এ গ্রন্থ উপন্যাসের মত সরস, কাব্যের মত অলঙ্কৃত, দর্শনশাস্ত্রের মত ভাব-গর্ভ, নাটকের মত বৈচিত্র্যময় এবং সঙ্গীতের মত মর্ম্মস্পর্শী।"—শ্রীকালিদাস রায়

"যে-কোন ভাষাকেই অলঙ্কৃত করিতে পারে।"—মানসী ও মর্ম্মবাণী

পাল-পার্ব্বণ   তিন আনা

৺উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

হিন্দুর রথ-দোল প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের ভাব-চিত্র।

বাঙলার কৃষকের কথা
এক টাকা

শ্রীহৃষীকেশ সেন

এই বইয়ে সেই প্রাচীনকাল হতে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত কৃষকের, জমির ও খাজনার ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে। নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে বাঙলার কৃষকের অবস্থা ক্রমে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, গ্রন্থকার তা এমন সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করে' বলেছেন যে আদ্যোপান্ত বইখানি একখানা করুণ উপাখ্যানের মতো পাঠকের মন বেদনায় পূর্ণ করিয়া তোলে।

"আমরা দেশে আছি কিন্তু ক'জন দেশের কথা জানি বা ভাবি। দেশ আমাদিগকে পালন ক'রছেন, এ কথা ক'জন স্মরণ করি। যিনি স্মরণ করান, ভাবান, তিনি পুণ্য কর্ম করেন।......পাঠককে বলি তিনি বইখানি পড়ুন আর ভাবুন।"—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্-এ, বিদ্যানিধি

বেকার সমস্যা
দেড় টাকা

শ্রীহৃষীকেশ সেন

দেশে আজ বেকার সমস্যা এমন ভীষণভাবে উপস্থিত হল কেন—গ্রন্থকার এর কারণ অনুসন্ধান করে' কি করলে এর প্রতীকার হয় তার উপায়ও নির্দ্দেশ করেছেন। সেই সঙ্গে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি উপায় অবলম্বিত হয়েছে সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। জাতির সব সমস্যার অন্তরালে কোন্ মহাসমস্যা লুক্কায়িত রয়েছে—বইখানা পড়লেই তা বুঝতে পারবেন।

শ্রীহৃষীকেশ সেন মহাশয় দুটি জিনিষ করতে জানেন, এক পড়তে আর-এক লিখতে। বইয়ের সঙ্গে যে তাঁর পরিচয় আছে তার প্রমাণ তাঁর লেখার পত্রে পত্রে, আর তিনি যে লিখতে জানেন তার প্রমাণ ছত্রে ছত্রে। এ বাজারে ও-দুটি গুণের একাধারে সাক্ষাৎলাভ নিত্য ঘটে না। নিত্য যা দেখা যায় সে হচ্ছে এই যে যিনি লেখেন তিনি পড়েন না, আর যিনি পড়েন তিনি লেখেন না।"—বীরবল (সবুজপত্রে)

অরবিন্দ-প্রসঙ্গ দশ আনা

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিত

শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদায় ছিলেন, সেই সময় সুলেখক দীনেন্দ্র বাবু তাঁহার গৃহ-শিক্ষক ছিলেন; দীনেন্দ্রবাবু তাঁহার অনন্যসাধারণ সুমধুর ভাষায় সেই সময়ের অরবিন্দ-প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন।

"যে শক্তি একদিন কেবল বাঙ্গলায় নয়, সমগ্র ভারতে নব জাতীয়তার আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই অসীম শক্তির বীজ কোথায় এই গ্রন্থে পাঠক তাহার সন্ধান পাইতে পারেন।—একে বাঙলার নির্ব্বাসিত সিংহের জীবনস্মৃতি, তারপর লিপিদক্ষ দীনেন্দ্রবাবুর লেখা, সুতরাং গ্রন্থখানি যে অতি মধুর হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

গুরুগোবিন্দ সিংহ এক টাকা

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শক্তিপূজা করে' যিনি শিখদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই মহাপ্রাণ শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের জীবন বৃত্তান্ত। কি করে' শিখশক্তি সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে' আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল—বইখানিতে তার সুন্দর বিবরণ দেওয়া আছে। গুরুর হাফটোন চিত্র সম্বলিত।

"শিখগুরুর মহৎ চরিত্র রচনার গুণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ভাষা শুদ্ধ অনাড়ম্বর। রচনা বেশ শৃঙ্খলাসম্পন্ন। বহু জ্ঞাতব্য কৌতূহলোদ্দীপক খণ্ড নাটি কাহিনী পুস্তকখানিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে। পড়িতে আরম্ভ করিলে ছাড়া যায় না। খুব সংযত সাবধানতায় লেখা। বালক বালিকারাও স্বচ্ছন্দে পাঠ করিয়া উপকৃত হইবে।"—প্রবাসী

"যাঁহারা দেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন বা করিতে ইচ্ছুক, এই জীবনী তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিবে ও ঐশ্বরিক প্রেরণা দৃঢ়ীভূত করিবে।"—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

ভারত উদ্ধার চার আনা

৺উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

স্বরাজ-সাধকের ভারত-উদ্ধারের কাহিনী—উপন্যাসের চেয়েও চমকপ্রদ।

সূচীপত্র

ঐন্দ্রজালিক

মূল্য পাঁচ সিকা]

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ঐন্দ্রজালিক

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক—
শ্রীরামেশ্বর দে
চন্দননগর।

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৩২

Printed by
KARTIK CHANDRA BOSE
for
U. RAY & SONS, PRINTERS
100, Gurpar Road. Calcutta.

উৎসর্গ-পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার "চার-ইয়ারী-কথা" পড়ে' যে আনন্দ পেয়েছি তার কথঞ্চিৎও যদি এই গল্পগুলি পড়ে' পান তবে এ-গুলি লেখা ব্যর্থ হয়নি বলে' মনে কর্‌ব। ইতি

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিজ্ঞাপন

এই গল্পের সবগুলিই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এর দুটি গল্পের ভাব ধারকরা। একটির একটি ফরাসী গল্প থেকে, আর-একটির একটি ইংরেজি কবিতা থেকে। বাকিগুলি স্বকপোল-কল্পিত।

লেখক